স্বাস্থ্যসমাচার পুস্তিকা নং ৩

শিশু-পালন।

ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি
সম্পাদিত।

১৯২০।

মূল্য ॥০ আনা।

সূচী।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ড্রগ প্রেসে
সম্পাদক দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৪৫ নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

শিশুমৃত্যুর আধিক্য জন্য শোকার্ত্ত শিশুদের শোভা যাত্রা।
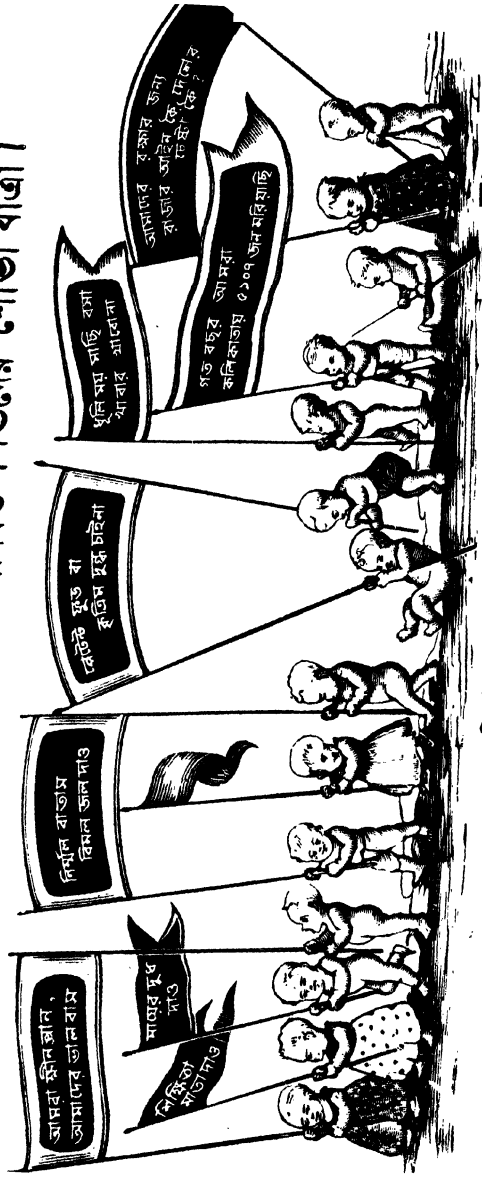
ভারতে প্রতি মিনিটে চারিটি করিয়া শিশু মরে।

শিশু-পালন

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

"Suffer the little children to come unto Me, and forbid them not; for of such is the Kingdom of Heaven."—JESUS CHRIST.

"শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দাও, বাধা দিও না; কারণ, স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।"

"ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ!
ধরায় উঠেছে ফুটি, ক্ষুদ্র শুভ্র প্রাণগুলি
নন্দনের এনেছে সংবাদ।"—রবীন্দ্রনাথ।

"Do ye hear the children weeping, O my brothers,
Ere the sorrow comes with years?
They are leaning their young heads against their mothers.
And *that* cannot stop their tears.
The young lambs are bleating in the meadows,
The young fawns are playing with the shadows,
The young flowers are blowing toward the west—
But the young, young children, O my brothers,
They are weeping bitterly!

They are weeping in the playtime of the others,
In the country of the free

They look up, with pale and sunken faces,
And their look is dread to see,

For they mind you of their angels in their places,
With eyes turned on Deity :

'How long,' they say, 'how long, O cruel nation,

Will you stand to move the world on a child's heart,—

Stifle down with a mailed heel its palpitation,
And tread onward to your throne amid the mart ?

Our blood splashes upward, O gold-heaper,
And its purple shows your path !

But the child's sob curses deeper in the silence
Than the strong man in the wrath !"

—Elizabeth Barret Browning.

শোন, ও তরুণ করুণ কণ্ঠে গগন আকুল রে !
পীড়িত শিশুর নীরব ব্যথায় পবন ব্যাকুল রে !
ছোট মাথা রাখে মার কোল পরে
নয়নে সলিল অবিরল ঝরে
এমন প্রভাতে শুকায়ে ঝরিবে জীবন-মুকুল রে !
শ্যামল কাননে মেষ-শিশু-দল মেতেছে আলোর সনে ;
মৃগশিশুগুলি ছায়া সাথে মিলি নাচিয়া লুকায় বনে।
মোদের প্রাঙ্গণে, বুক ফেটে যায়,
দেবশিশুদল কাঁদে নিরুপায়,
দখিন-সমীর-দোলায় দুলিছে গোলাপ বকুল রে !
শুষ্ক বদন, শীর্ণ নয়ন দুঃখের ছায়ায় ঢাকা
স্বরগের শিশু মরতে আসিল এমন কালিমা-মাখা ?

কতকাল—ওগো আর কতকাল
হে নিষ্ঠুর জাতি, রবে দগ্ধভাল,
অস্বাস্থ্যসাগরে ডুবায়ে মারিবে শিশু এ কালিমা-মাখা।
বংশের পাপ, পিতার দৈন্য, ধরি কলঙ্ক-ডালা,
কোমল দেহের রক্তে রঙান ধনীর স্বর্ণমালা,
কাঁদিছে পেষিত পীড়িত সে চিতে ;
আনন্দ কি গো নাই ধরণীতে
গর্ব্বিত শির জাতির ললাটে এ পাপ কলঙ্ক-লেখা !
কাঁদিছে তাহারা, পিষিছে মোদের আলস্য-রথের চাকা।

এক দিন তরুণ কবিহৃদয়ে যে ব্যথা জাগিয়াছিল, বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে সমস্ত সভ্যজগৎচিত্তে তাহা আঘাত করিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে বহুকাল ধরিয়া শিশুগণের হিতসাধন সম্বন্ধে মহা আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিৎ, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ, চিকিৎসক, ভাবুক, সুধীমণ্ডলী সকলে শিশুজীবন, শিশুচরিত্রগঠন, শিশুশিক্ষা, শিশুস্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন ; বর্ত্তমান সমাজে শিশুগণের অবস্থা সম্বন্ধে নানা চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিতেছেন ; নানা তর্কবিতর্ক করিয়া পূর্ণ শিশুজীবন গঠনের উপায় ও নিয়ম উদ্ভাবন করিতেছেন। শিশুগণের প্রতি সমাজের কর্ত্তব্য, মাতাপিতার কর্ত্তব্য এ সমস্ত মত প্রচারার্থ মাসিক পত্রিকা মুদ্রিত হইতেছে। "Prevention of Cruelty to Children" "মাতাপিতা ও সমাজের অন্যায় অত্যাচার হইতে শিশুগণকে রক্ষার্থ" মণ্ডলী গঠিত হইতেছে, মাতৃপিতৃহীন বালকদিগের জন্য আশ্রম ও বিদ্যালয় নির্ম্মিত হইয়াছে, কত সাধু ও সাধ্বী শিশু-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ইউরোপ আজ খৃষ্টের বাণী মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, "Whosoever shall receive this child in My

name receiveth Me"—যে শিশুর সেবা করে সে আমার সেবা করে। শুধু ধনীর রাজপ্রাসাদে নয়, দরিদ্রের কুটীরে, দিনমজুরের ধূলিময় অন্ধকারময় ভাঙ্গা ঘরের কোণে দেবতা জন্মিতেছেন। ইউরোপ জানিয়াছে, শুধু ১৯১৯ বৎসর পূর্ব্বে জেরুজেলামে এক আস্তাবলের কোণে দরিদ্রা মেরীর কোলে দেবতা জন্মিয়াছিলেন, তাহা নহে; সেই তার একমাত্র শেষ আবির্ভাব নয়;—প্রতিক্ষণে প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার আবির্ভাবে কত অনাথা পীড়িতা দরিদ্রার দীন কুটীর ধন্য। সেই শিশু-দেবতার পূজা আজ ইউরোপের সাধনা হইয়াছে। খৃষ্টান ভক্ত কবি গাইয়াছেন—

"He who gives a child a treat
Makes joy-bells sing in Heaven's Street
And he who gives a child a home
Builds palaces in Kingdom come.
And she who gives a baby birth
Brings Saviour Christ again to Earth."

MASE FIELD.

"দুঃখী শিশুকে আনন্দিত করিলে স্বর্গে আনন্দধ্বনি উত্থিত হয়; অনাথ শিশুকে গৃহে আনিলে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়; যে মাতা শিশুকে প্রসব করেন, তিনি ত ত্রাণকর্ত্তা খৃষ্টকে আবার পৃথিবীতে আনয়ন করেন।

(২)

"O child of Paradise !
"Boy who made dear his Father's Home
In whose deep eyes
Men read the welfare of the time to come."

EMERSON.

"হে দেবশিশু, হে গৃহের আনন্দ, তোমার দীপ্ত নয়নে জগতের অনাগত কল্যাণ পাঠ করিতেছি।"

"Where city of the healthiest fathers stands
Where city of the best-bodied mothers stands
There the great city stands."

WHITMAN.

"যে নগরে স্বাস্থ্যবান পিতা ও শক্তিসম্পন্না মাতা বাস করেন, সেই নগরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

"The child is father of the Man."

WORDSWORTH.

শিশুই ভাবী মানব।

শিশুগণই ভবিষ্যৎ বংশ, ও জাতির আশা।

"There are two supreme tests to the greatness for a nation—its care for its cradle and its graves."

REV. MASTERMAN.

"মৃতের প্রতি সম্মান ও শিশুগণের প্রতি যত্ন দ্বারা জাতির মহত্ত্ব জানা যাইতে পারে।"

আমরা বর্ত্তমান বংশ-উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরে কঠোর সাধনা করিয়া আরোহণ করিতে পারি; জ্ঞানে, ধনে জগতের জাতিবর্গের শীর্ষস্থানীয় হইতে পারি; কিন্তু যদি ভবিষ্যতের জন্য না ভাবি, যদি পরবর্ত্তী বংশের দিকে না চাই, যদি আমাদের পুত্রকন্যাগণ অনুপযুক্ত বংশধর হয়—তবে বৃথা আমাদের সাধনা, বৃথা আমাদের জ্ঞান, ধন। পিতার আশা পুত্রে; এ জীবনে পিতা যা করিতে, যা হইতে পারিলেন না, তাঁহাদের হৃদয়ের যে বাসনা, যৌবনের যে স্বপ্ন জীবনে পূর্ণ হইল না, তিনি আগ্রহ ও আনন্দের সহিত চিন্তা করেন, তাঁহার পুত্র তাহা ঘটাইবে। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার

পুত্রকে গড়িতে হইবে, চালাইতে হইবে। এক বংশ বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু ঘরে যে ভাবী জাতির জন্ম হইল, যে অনাগত সমাজের কর্ম্মী ও ভাবুকগণের অস্ফুট কলধ্বনি উঠিল, তাহাদিগকে লক্ষ্য না করিয়া সেই বংশ যদি কার্য্য করে, তবে ভাবী বংশধরগণ পিছাইয়া পড়িবে।

প্রবাসী বলেন, "১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে শিশুদের মৃত্যুর হার হাজারে ২৯৫ হইয়াছিল; অর্থাৎ যতগুলি শিশু জন্মে, তাহার প্রত্যেক ৫টীর মধ্যে একটীর বেশী মারা পড়ে। অষ্ট্রেলেসিয়ায় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শিশুমৃত্যুর হার হাজারকরা ৭০ জন। এখন সম্ভবতঃ আরও কম। সুতরাং আমাদের দেশে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শিশুর মৃত্যু নিবার্য্য। বাল্য-মাতৃত্ব নিবারণ, অন্তঃসত্তা অবস্থায় স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় শিক্ষাদান, সূতিকা-গৃহের উন্নতিসাধন, ধাত্রীদিগকে ধাত্রীবিদ্যা শিখান, ভাল দুধ যোগান, দেশের আর্থিক অবস্থার ও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন, প্রভৃতি উপায়ে সহস্র সহস্র শিশুর প্রাণ রক্ষা করা যাইতে পারে।"

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে শিশু সম্বন্ধে ভাবিবার ও আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের নানা দেশহিতকর, জনহিতকর কর্ম্মের মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্তম সাধনা। বর্ত্তমান জাতীয় জীবনে যা নিশার স্বপ্ন রহিল, হৃদয়ের গোপনে যা অব্যক্ত, পত্রিকা ও সংবাদপত্রে যা শুধু লিপিবদ্ধ রহিল, বঙ্গ জনকজননীর কঠোর সাধনায়, হয় ত কোন অনাগত দিবসে আমাদের আশা, সোণার স্বপ্ন সফল হইবে।

(৩)

"No occupation, profession, or mission in life is of so great importance, no privilege so high and holy; no calling so frought with wonderous possibilities as that of true parent-hood. In no other relations of life

the finite and the infinite are more closely connected than in the work of the faithful father and mother. They stand before God as surety for these things."

Mrs. Kellogg.

"পিতৃত্ব, মাতৃত্বের ন্যায় জীবনে কোন কার্য্য এত মহান, এত সুন্দর, এত হিতকর নহে। এই পিতৃত্ব-মাতৃত্ব বোধে অনন্ত ও সান্তের মিলন হয়, মাতা পিতা সন্তানের জন্য পরমেশ্বরের নিকট দায়ী।"

"Delightful task ! to rear the tender thought
To teach the young idea how to shoot
To pour the fresh instructions over the mind
To breathe the enlivening spirit and to fix
The generous purpose in the glorious breast."

"তরুণ হৃদয়গুলিকে গড়িয়া তোলা, কোমল প্রাণগুলিকে উচ্চ ভাবে প্রণোদিত করা, তাহাদিগকে শিক্ষা দান করা, তাহাদের গতি স্থির করিয়া দেওয়া কি আনন্দকর স্বর্গীয় ব্রত!"

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃক্রোড়ে; মাতার যত্ন ও স্নেহের উপর তাহার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে। বঙ্গমাতৃকুল অতি কোমলহৃদয়, অতি স্নেহপরায়ণ; কিন্তু প্রচণ্ড শক্তি যথাগতিতে না চলিলে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল হয়, সেইরূপ তাঁহাদের অশিক্ষিত স্নেহ অনেক সময় শিশুর অনিষ্ট সাধন করে—কবি তাই দুঃখে গাহিয়াছেন—

"সাত কোটি সন্তানেরে, হে বঙ্গজননি!
রেখেছ বাঙ্গালী করে, মানুষ করোনি।"

শিশুকালে দেহ ও মন তপ্ত তরল লৌহের মত;—যে ছাঁচে ঢালিবে সেই আকার ধারণ করিবে, যে ছবি সম্মুখে ধরিবে তাহার

ছায়া চিরমুদ্রিত থাকিবে। এই শিশুকালে সেবা ও শিক্ষা দ্বারা বংশগত ব্যাধি, জাতিগত দোষ, মজ্জাগত কুসংস্কার ও পাপ সকল দূর হইতে পারে। আমার মনে হয়, যদি এক বংশ কি দুই বংশের শিশুগণের কর্ণে ভূতপ্রেতের কথাগুলি প্রবেশ না করে, তবে কয়েক শত বৎসর পরে বালকগণ অন্ধকার পথে যাইবার সময় কোন ভয়ে কাঁপিবে না। কিন্তু, হায়! শিশু-জীবনে অযত্নপালিত কত হতভাগ্যের জীবন কেবল দুঃখময় হয় নাই, উহা কলঙ্ক-কালিমা-মাখা হইয়াছে। বিলাতের এক জেলখানা পরিদর্শক লিখিয়াছেন, "There is an undoubted connection between ill-nourished boys and prison population." কারা-গৃহবাসীগণের অতীত জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "অযত্নপালিত বালকগণই পরে জাতির পাপভার বৃদ্ধি করে।" এ দুর্ভাগাদের জন্য দায়ী কে, সমাজতত্ত্ববিৎ তাহার বিচার করুন।

আমাদের শিক্ষকগণের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তিরই এই মহা কর্ত্তব্যবোধ আছে। ভারতের প্রাচীনকালে গুরু গৃহে বাস করিয়া প্রকৃতি-মাতার ক্রোড়ে নির্ম্মল অসীমতার মাঝখানে যে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ছিল—তাহা কি সুন্দর, কি স্বাভাবিক! সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই; এ নূতন যুগে নিত্য এ নূতন দুর্গম পথে, নব নব সমস্যার সমাধান করিয়া জাতিকে চলিতে হইবে। পাশ্চাত্য জগতে চিন্তাশীল লেখকগণ শিশুপাঠ্য সাহিত্য-সৃষ্টি করিতেছেন; বিদ্যালয়ে কিরূপ শিক্ষা দিতে হইবে, কিরূপে তরুণ হৃদয়ে সৎনীতির বীজ বপন করিতে হইবে,—কিরূপে শিশু কুঁড়িকে স্নেহের রসে, জ্ঞানের আলোকে, ধর্ম্মের বাতাসে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে—তৎসম্বন্ধে নানা গ্রন্থ লিখিতেছেন। শিশুদের স্বাস্থ্যোপযোগী বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। দুর্ব্বল-স্বাস্থ্য বালকদিগের জন্য উন্মুক্ত স্থানে ক্লাস হইতেছে। বিদ্যালয়ের চিকিৎসকগণ প্রতি ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন, তাঁহাদের

উন্নতির বা অবনতির প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাঁহাদের চক্ষুর দোষ, দন্তের দোষ লক্ষ্য করেন ও প্রতি ছাত্রের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। আমাদের দেশে সে সুদিন আসে নাই ; আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী-লোলুপ পরীক্ষার্থিগণের মস্তকে দারুণ পুস্তকের বোঝা চাপাইয়া নিশ্চিন্ত। আমাদের পাঠনিরত 'সুবোধ সুশীল' ছাত্রগণকে দেখিয়া Wordsworth-এর বাণী মনে হয়—

"Up up ! my friend, and quit your book,
For surely you will grow double,
Up, up ! my friend and clear your look
Why all these toil and trouble."

"ওঠ বন্ধু, ওঠো, তোমার বই মোড়। আমি বল্‌ছি, তুমি অচল স্থাণু পঙ্গু হয়ে আছ, তোমার বিকাশ হয় নাই। ওঠো, ভাল করে চাও, কেন এ বৃথা চিন্তা, এ পণ্ড পরিশ্রম।"

এ অধঃপতিত দেশে মহাযজ্ঞের আয়োজন করিতে হইবে, শতযুগ-সঞ্চিত পাপ ও কুসংস্কার এই যজ্ঞে ভস্মীভূত করিতে হইবে। শক্তি অল্প বটে, কিন্তু বক্ষে উৎসাহ আছে, এ স্তিমিত আশা আর নির্ব্বাপিত হইবে না।

দেশভক্ত জনহিতৈষী সুধীবর্গকে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করিতে আহ্বান করিতেছি। সভাসমিতিতে পত্রিকায় পুস্তিকায় এই মত সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচারিত হউক। মাতা পিতা শিক্ষকগণ জীবনে ইহার কঠোর সাধনা করুন। শিশুর স্বাস্থ্যের উপরেই তাহার ভাবী জীবন, তাহার চরিত্র, প্রতিভা, কর্ম্মশীলতা নির্ভর করে।

শিশুপালনে মাতার কর্ত্তব্য—(১) শিশুর আহার (২) বাসস্থান (৩) নিদ্রা (৪) সঙ্গী (৫) ক্রীড়া ইত্যাদি।

শিশুর শিক্ষায় শিক্ষকের কর্ত্তব্য—(১) বয়স (২) স্থান (৩) পুস্তক (৪) বুদ্ধিগঠন (৫) চরিত্রগঠন (৬) স্বাস্থ্য পর্য্যবেক্ষণ বিষয়ের আলোচনা ইত্যাদি।

(৪)

"Come, let us live with our children,
Leading them tenderly on—
In the fields that God's love—light
Ever shines brightly upon ;
Then when our feet grow too weary
For the safe guidance of youth
We shall be led like the children,
To Him, who is goodness and truth."

"আমাদের গৃহ শান্তিময়, আনন্দময় হউক, দেবগণ যে আবির্ভূত হইয়াছেন তাহা অনুভব করি, অর্ঘ্য সাজাইয়া সেবানিরত হই।"

আশা করি দেশে সুদিন আসিবে। পথে পথে অন্ধকার গলিতে যে বালকদল ঘুরিয়া বেড়ায়, মাতৃপিতৃহীন গৃহহারা যে দুর্ভাগারা শত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া সারা জীবন আপনাকে ধিক্কার দেয়, পতিতা রমণীগণের পাপে কলঙ্কিত যে শিশুগুলি মাতৃহস্তে প্রাণ হারায়, বা দুঃখে ক্ষোভে অপমানে সমাজের অন্তরালে বসিয়া জীবনের বোঝা বহন করে, বা উপায়ান্তর না দেখিয়া পাপসাগরে চিরজীবন নিমগ্ন হয়, সমাজ তাহাদিগকে ঘরে তুলিয়া লইবে, তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। ইউরোপে এইরূপ Orphan Home হইতে কত জ্ঞানী, কর্ম্মী ও বিশ্বহিতৈষীর জন্ম হইয়াছে। শুধু ঘরের নয়, পরের শিশুর সেবাতেও জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। চাই সিদ্ধার্থের স্বার্থত্যাগ, চাই চৈতন্যের অনন্ত প্রেম। তবে এ জাতির উদ্ধার হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গর্ভ ধারণ

সকল পিতামাতাই যে সুসন্তানের কামনা করিয়া থাকেন, এ সম্বন্ধে বোধ করি মতভেদ ঘটিতে পারে না। সুসন্তান নরনারীর জীবনের সর্ব্বপ্রধান কামনার ধন। সেই সুসন্তান লাভ করিতে হইলে, পূর্ব্বে যে কতখানি সতর্ক হইয়া কাজ করিতে হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

উত্তম শস্য উৎপাদন করিতে হইলে উত্তম বীজ এবং সু-উর্ব্বর ক্ষেত্র আবশ্যক। সুসন্তান লাভ করিতে হইলেও তদ্রূপ পিতার বীজ বিশুদ্ধ, সতেজ, সর্ব্বপ্রকার দোষমুক্ত, এবং মাতার গর্ভাশয়ও নির্দ্দোষ হওয়া চাই।

যৌবনপ্রাপ্ত পুরুষ দেহের শুক্র (Sperm) এবং নারীর দেহের আর্ত্তব (Ovum) নারীর গর্ভাশয়ে মিলিত হইয়া সন্তানরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া দশমাস পরে ভূমিষ্ঠ হয়। অতএব শুক্র আর্ত্তকের বিশুদ্ধতার উপর সন্তানের শুভাশুভ, অর্থাৎ তাহার স্বাস্থ্য, বল, বুদ্ধি, এবং দীর্ঘায়ু নির্ভর করিতেছে। এই কারণে গর্ভাধান অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে জনক-জননীকে শুচি, সংযত, পবিত্র ভাবে থাকিতে হইবে,—আমাদের শাস্ত্রকারেরা ইহাই আদেশ করিয়াছেন। পুরুষের শুক্র ও নারীর আর্ত্তব বা শোণিত দোষযুক্ত থাকিলে চিকিৎসার দ্বারা তাহাদিগকে দোষমুক্ত করিতে হইবে। এইরূপে চিকিৎসার দ্বারা শুক্র-শোণিত বিশুদ্ধ হইলে, পরে গর্ভাধান করিবে।

যদি পিতা কিংবা মাতার সিফিলিস্ (উপদংশ বা পারার রোগ) বা

গণোরিয়া অর্থাৎ মেহ রোগ থাকে তাহা হইলে অনেক স্থলে আদৌ গর্ভ হয় না। পরন্তু যদি গর্ভাধান হয় তাহা হইলে হয় মৃত শিশু জন্মে, না হয় ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু নানা রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। জননীর মেহ রোগ হইতে অনেক শিশু জন্মান্ধ হইয়া যায়। অনেক স্থলে হয় ত একটী হৃষ্টপুষ্ট শিশু জন্মগ্রহণ করে। এই সুন্দর শিশুটি দেখিয়া সকলে কত আনন্দিত হয়। মাতাপিতা শিশুর মুখ দেখিয়া স্বর্গের আনন্দ অনুভব করেন কিন্তু হায়, নিয়তি কি কঠোর! হয় ত তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে যৌবনে অজ্ঞতা বশতঃ পিতা সিফিলিস্ রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাহার শাস্তি এই নবাবত অতিথির উপর পড়ে। স্বর্গের ফুলটী শুকাইয়া যায়। সবল সুশ্রী ৮৷৯ বৎসরের বালক চক্ষুরোগ ও কর্ণরোগাক্রান্ত হইয়া চির জীবনের জন্য অন্ধ বা বধির হইয়া যাইতে পারে। পিতামাতার জীবনের আশা ভরসা তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত দোষের ফলে চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। কিন্তু যদি পিতামাতা জ্ঞানী হন, তাহা হইলে উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা তাঁহারা রোগমুক্ত হইতে পারেন। রোগমুক্ত হইলে তাঁহাদের যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে তাহারা সুস্থকায় হইবে। গর্ভাবস্থায় মাতার শরীরে উপদংশ রোগের বিশেষ কোন চিহ্ন থাকে না। কিন্তু যদি পিতার এই রোগ আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় বা রক্ত পরীক্ষা দ্বারা মাতার শরীরে রোগ নির্ণয় করা যায়, তাহা হইলে গর্ভাবস্থায় রীতিমত চিকিৎসা করান আবশ্যক। গর্ভাবস্থায়ও সুচিকিৎসা হইলে সুস্থ সন্তান লাভ করা যাইতে পারে। জাতীয় স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে উপদংশ বিষের ন্যায় আর কোন বিষ নাই। ইহা বংশ-পরম্পরায় প্রকুপিত হইয়া যে কেবল বংশের উচ্ছেদ করে তাহা নহে; ইহা হইতে নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হওয়ায় অকালে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শিশুমৃত্যু নিবারণ শিশু-স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে উপদংশ ও গণোরিয়া রোগ প্রতিকার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

ঋতুমতী স্ত্রী ঋতুর প্রথম দিবস হইতে দিবসত্রয় ব্রহ্মচারিণী হইয়া দিবানিদ্রা, নেত্রে অঞ্জন প্রদান, অশ্রুপাত, স্নান, চন্দনাদি অনুলেপন, অভ্যঙ্গ, নখচ্ছেদন, ধাবন, অতিহাস্য, অধিক কথন, অতিশব্দ শ্রবণ, কেশবিন্যাস, বায়ুপ্রবাহ ও শ্রম পরিহার করিবে। পরে চতুর্থ দিবসে ঋতুস্নান করিয়া সর্ব্বপ্রথমে স্বামী-দর্শন করিবে। পরে যথাসময়ে স্বামীর সহিত মিলিত হইবে। পুরুষও গর্ভাধান দিবসের একমাস পূর্ব্ব হইতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক শুচি, সংযত ও পবিত্র হইয়া থাকিবে। চতুর্থ দিবস হইতে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত গর্ভাধানের উপযুক্ত কাল।

গর্ভোৎপত্তির পর প্রসবকাল পর্য্যন্ত নারীকে সতর্ক থাকিতে হয়। সন্তান যতদিন গর্ভে অবস্থান করে, তত দিন জননী যেমনভাবে জীবন যাপন করেন, সন্তানও সেইভাবে গড়িয়া উঠে। এই জন্যই গর্ভাবস্থায় জননীর সতর্কতা অবলম্বন করা অতীব আবশ্যক। গর্ভিণী স্ত্রীলোক অতিশ্রম, মৈথুন, উপবাস, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, শোক, যানারোহণ, উপু হইয়া বসা, মলমূত্রাদির বেগধারণ প্রভৃতি পরিহার করিবে গর্ভিণীর আচরণে দোষ ঘটিলে গর্ভস্থ সন্তানের অঙ্গবৈকল্য এমন কি অকালে গর্ভপাত প্রভৃতিও হইতে পারে। গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর মনে খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি অনেক বিষয়ে অভিলাষ জন্মে। নিতান্ত উৎকট অভিলাষ না হইলে, যথাসম্ভব গর্ভিণীর অভিলাষ পূরণ করা কর্ত্তব্য। গর্ভিণীর সুসঙ্গত অভিলাষ সকল পূর্ণ হইলে সে যথাকালে বীর্য্যবান, দীর্ঘায়ু সন্তান প্রসব করিতে সমর্থ হয়। এই জন্যই বোধ হয় আমাদের দেশে মহিলা-ব্যবহারে গর্ভিণী স্ত্রীলোকদের কাঁচা ও পাকা 'সাধ' দিবার নিয়ম আছে।

এইরূপে সর্ব্ববিধ সতর্কতা অবলম্বন করিবার পর যে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবে, সে সুসন্তান হইয়া পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। এই

নবাগত অতিথিকে কি ভাবে লালন পালন করিতে হইবে, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে বিবৃত হইতেছে।

গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গল কামনায় গর্ভিণীর যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করা উচিত, এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রকারেরাও উপদেশ দিয়াছেন। গর্ভস্থ ভ্রূণ জননীর দেহের অংশস্বরূপ। স্কুতরাং জননীর শরীরের অবস্থা অনুসারে ভ্রূণের দেহের অবস্থাও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। জননী যাহা আহার করেন, সেই খাদ্যেই ভ্রূণদেহও পুষ্টিলাভ করে। জননীর পক্ষে যাহা কুখাদ্য, তাহা ভ্রূণদেহেরও অনিষ্ট সাধন করে; গর্ভিণীর খাদ্যের দোষে ভ্রূণও পীড়িত হইয়া থাকে। অতএব ভ্রূণের দেহের যত্ন লওয়া জননীর শরীরের যত্ন লওয়ার প্রকারান্তর মাত্র। এমন কি, জননীর দেহের সমগ্র সার ভাগই ভ্রূণের পুষ্টিসাধনে ব্যয়িত হইয়া থাকে। জননীর দোষেই অধিকাংশ স্থলে অকালে গর্ভপাত হয়; কিম্বা, সময়ে সন্তান প্রসূত হইলেও, গর্ভাবস্থায় জননী যদি স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম পালনে অবহেলা করিয়া থাকেন, তবে নবপ্রসূত শিশুও দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। জন্মের পর এক বৎসরের মধ্যে যে সকল শিশুর মৃত্যু হয়, তাহা প্রধানতঃ জননীর দোষেই ঘটিয়া থাকে। সন্তানের বিকলাঙ্গতার জন্যও পিতামাতা, বিশেষতঃ জননীকেই প্রধানতঃ দায়ী হইতে হয়। এই হেতু, গর্ভিণীর স্বাস্থ্য যাহাতে খুব ভাল থাকে, ইহা কেবল তাহার নিজের দেখা কর্ত্তব্য নহে; তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরও ইহা লক্ষ্য করা সর্ব্বপ্রধান কার্য্য।

গর্ভিণীর খাদ্য পুষ্টিকর ও লঘুপাক হওয়া আবশ্যক। তিনি গুরুভোজন হইতে সর্ব্বদা বিরত থাকিবেন। গর্ভিণী অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম করিবেন না বটে, কিন্তু একেবারে শ্রমবিমুখও হইবেন না। অলসতা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। অল্পস্বল্প শারীরিক পরিশ্রম গর্ভিণী এবং গর্ভস্থ ভ্রূণ উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত উপকারী। গর্ভিণীর

যদি অল্প পরিশ্রমের কোন কাজ করিবার না থাকে, তবে, দিবারাত্রি অলস ভাবে বসিয়া না থাকিয়া, তিনি প্রত্যহ কিছুক্ষণ ধরিয়া নিয়মিত ভাবে সামান্য পরিমাণে ব্যায়াম করিতে পারেন। মিনিট দশ কাল চিত্ত সংযোগ সহ হস্ত পদাদি সঞ্চালন, এবং গভীর ভাবে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ যথেষ্ট হইতে পারে। ইহা সুখ-প্রসবের একমাত্র সদুপায়। এই ব্যায়াম মুক্ত স্থানে করিতে পারিলেই ভাল হয়। তবে প্রবল বায়ু বহিতে থাকিলে ঘরের বাহিরে গর্ভিণীর ব্যায়াম করা ত দূরের কথা, স্থিরভাবে অবস্থিতি করাও ভ্রূণের পক্ষে নিরাপদ নহে। অল্প শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়ামের ফলে ভ্রূণ যথেষ্ট পরিমাণে বায়ু, তথা, প্রাণবায়ু (oxygen) পাইয়া থাকে, তাহার রক্ত পরিষ্কার থাকে, ক্লেদ সকল বহির্গত হইয়া যায়। কিন্তু যাহাতে প্রসূতির শরীরের ক্লান্তি জন্মে, কষ্ট হয়, এরূপ শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম সর্ব্বদা পরিহার্য্য।

আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রও নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, The pregnant woman should be shielded from morbid sensations, evil influences, or unpleasant sights, and relieved of depressing forebodings as to the state of the unborn infants ; অর্থাৎ গর্ভিণীর মনে যেন কোন পীড়াদায়ক ভাবের উদয় না হয়। কুলোকের কু প্রভাব হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইবে। কুৎসিত দৃশ্য যেন তাঁহার নয়নগোচর না হয় ; এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের অমঙ্গল আশঙ্কা যেন তাঁহার মনে জন্মিতে না পারে।

ইউরোপীয়া মহিলাদের গাউন সাধারণতঃ অত্যন্ত গুরুভার। সামাজিক নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ কিম্বা আমোদ প্রমোদের স্থলে যাইবার সময় তাঁহারা এই গুরুভার গাউনের উপর আরও গুরুভার পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু গর্ভিণী স্ত্রীলোকদের পোষাক পরিচ্ছদ বেশী ভারী হইলে গর্ভস্থ ভ্রূণের অনিষ্টের আশঙ্কা আছে ; তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বিকৃতি ঘটাও

অসম্ভব নহে। আর গর্ভোদরের উপরে পোষাক খুব আঁটিয়া পরিধান করাও উচিত নহে।

প্রথম বারের গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর স্তনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। যদি স্তনের বোঁটা খর্ব্ব বা সঙ্কুচিত থাকে তাহা হইলে লম্বা ও পুষ্টি করিবার জন্য গর্ভিণীকে বিশেষরূপ যত্ন লইতে হইবে। গর্ভাবস্থায় সপ্তম মাস হইতেই স্তনটিকে নিয়মমত টানিয়া তাহার বোঁটাকে লম্বা ও পুষ্ট করিবে। এই প্রক্রিয়ার জন্য অল্প তৈল বা ঘৃত ব্যবহার করা বিধেয়।

আমাদের দেশীয় প্রণালীতে গর্ভিণীকে উগ্রবীর্য্য ঔষধ সেবন করানো নিষিদ্ধ। পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরাও গর্ভিণীর ঔষধ সেবনের বিরোধী। তবে প্রাণ-সংশয় রোগের স্থলে ঔষধ সেবন অনিবার্য্য হইয়া পড়িলে, সুচিকিৎসকের পরামর্শমত ঔষধ ব্যবহার করা বিধেয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

গর্ভপাত

গর্ভধারণ স্বাভাবিক কার্য্য হইলেও গর্ভিণীর স্বাস্থ্যবিশেষে ইহা অতীব গুরুতর হইয়া পড়ে। গর্ভাবস্থায় এই জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সকল প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অজ্ঞতা বা অযত্ন বশতঃ বা বৃথা লজ্জার বশবর্ত্তী হইয়া এতাদৃশ গুরুতর অবস্থায় শরীরের অযথা ব্যবহার করিলে গর্ভিণীর নিজের ও ভ্রূণের নানা প্রকার অসুখ ও অনিষ্ট হইতে পারে। গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর শরীর অসুস্থ হইলে অনেক সময়ে গর্ভপাত হয়। প্রসবাপেক্ষা গর্ভপাতেই অত্যন্ত অধিক যাতনা ও মনঃকষ্ট হয় এবং বিবিধ দুর্ঘটনাও ঘটিতে পারে। একবার গর্ভপাত হইলে সেই গর্ভিণী গর্ভপাতপ্রবণ প্রায়ই হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ গর্ভপাত হইলে গর্ভিণী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়, সংসার সুখে বঞ্চিত হয় এবং নানারূপ রোগে আক্রান্ত হয়। গর্ভপাতে অভ্যস্ত হইলে গর্ভসঞ্চার ও গর্ভপাত উভয়ই শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হয়। জনৈক স্ত্রীলোকের ৫ বৎসরের মধ্যে ২২ বার গর্ভপাত হইয়াছিল। একবার গর্ভপাতের অভ্যাস হইলে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া সহজ নহে। এই জন্য গর্ভিণীদিগকে সাবধান করিবার জন্য গর্ভপাতের কারণ গুলি নিম্নে বর্ণিত হইল। এই সকল বিষয় হইতে সাবধানে থাকিলে প্রায়ই গর্ভপাত হয় না।

গর্ভপাতের কারণ দুই প্রকারঃ—**নিবার্য্য** (Preventable) যথা (১) উচ্চস্থান হইতে পতন। (২) গর্ভাশয়ের উপরিভাগে আঘাত বা গুরুতর চাপ, (৩) অধিক পরিশ্রম, (৪) দৌড়ে যাওয়া (৫) রাত্রি জাগরণ, (৬) উচ্চনীচ স্থান দিয়া পুনঃ পুনঃ গমনাগমন (৭) ভারি বস্তু তোলা যথা ভাতের হাঁড়ী, জলের কলসী, ইত্যাদি, (৮) উগ্র জোলাপ ব্যবহার (৯) মানসিক বিকার, যথা ক্রোধ, ভয়প্রাপ্তি, শোক, হর্ষ, অতি ক্রোধ, ও মৈথুন, অতি শোক ইত্যাদি। (১০) সর্ব্বদা সুখাভ্যাস প্রযুক্ত শরীরের

কোমলতা ও শিথিলতার জন্য সাধারণ দুর্ব্বলতা (১১) অতি কুন্থন (১২) অতি চীৎকার স্বরে ঝগড়া বা গান (১৩) নৃত্য প্রিয়তা (১৪) চিকিৎসা দোষ।

প্রবল জ্বর, আমাশায়, কলেরা, বসন্ত, উপদংশ ইত্যাদি পীড়াতেও গর্ভপাত হয়।

অনিবার্য্য (Inevitable) কারণ গুলি যথা :—কোনও কারণে গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট বা বিকৃত হইলে যে গর্ভপাত হয় তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ভ্রূণ শরীরের নানারূপ রোগ, ভ্রূণের পুষ্টি সাধনের ব্যাঘাত এবং ফুলের অযথাস্থানে জরায়ু মধ্যে সংযোগ জন্য এই সব গর্ভপাত হয়। চিকিৎসায় ইহার বিশেষ প্রতীকারও হয় না।

গর্ভপাত নিবারণের উপায়।

গর্ভিণী স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য নিয়মমত পরীক্ষা করিয়া কোনওরূপ ব্যতিক্রম দেখিলে তাহার ব্যবস্থাই গর্ভপাত নিবারণের সহজ উপায়। অভ্যস্ত গর্ভপাত স্থলে গর্ভাধান হইলে গর্ভিণীগণের স্থান পরিবর্ত্তন বা স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস এবং গর্ভপাতের পর অন্ততঃ দুই তিন বৎসরের মধ্যে যাহাতে গর্ভ না হয় এরূপ যত্ন করিতে হইবে। গর্ভসঞ্চার হইলে সর্ব্বদা সংযমী এবং পূর্ব্ব গর্ভপাতের নির্দ্দিষ্ট সময়ে অধিকতর সাবধান হওয়া উচিত। হঠাৎ দুর্ব্বলতা বোধ, ক্ষুধামান্দ্য, জ্বরভাব, জ্বর, তল-পেটের নীচে ভারবোধ, কটি ও উরুতে বেদনা, রক্তস্রাব বা রক্ত মিশ্রিত তরলস্রাব প্রভৃতি কোনও লক্ষণ উপস্থিত হইলেই বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে। তবে চিকিৎসকের ব্যবস্থার পূর্ব্বেই তলপেটে ও প্রসবদ্বারে ঠাণ্ডা জলপটী লাগাইবে এবং আহার্য্য বস্তু সকল শীতল করিয়া অল্প পরিমাণে আহার করিবে। পরে চিকিৎসকের ব্যবস্থা মত ঔষধ ও পথ্যাদি সেবন করিবে এবং এইরূপ অবস্থায় রোগী কদাচ নড়াচড়া করিবে না। মলমূত্র ত্যাগও শয্যার পার্শ্বেই বা শয্যাতে থাকিয়াই হওয়া উচিত।

চতুর্থ অধ্যায়

সূতিকাগার।

সন্তান প্রসূত হইবার পর শিশু ও তাহার জননীকে এক মাস কাল সূতিকাগারে যাপন করিতে হয়। আমাদের দেশের সেকেলে ব্যবস্থায় এই একমাস কাল প্রসূতি ও শিশুর পক্ষে বড় বিষম কাল।

গর্ভিণীর সন্তান প্রসবের সময় আসন্ন হইয়া আসিলে, দিন থাকিতে বাড়ীর লোকেরা, এবং অবস্থাবিশেষে গর্ভিণী নিজেও সূতিকাগারের বন্দোবস্ত করিতে থাকেন। এই সূতিকাগারকে চলিত কথায় আঁতুড়-ঘর বলা হয়। এই শব্দটিকে সাধু ভাষায় আতুর ঘর বলিলে ইহা সার্থকনাম হইতে পারে। কারণ, সন্তান প্রসবের পর প্রসূতি এবং প্রসূত সন্তান উভয়েই আতুর বই আর কিছুই নয়। তাঁহাদিগকে এক মাস যে কক্ষে বাস করিতে হইবে, তাহাকে আতুর ঘর (হস্পিটাল) বলাই ঠিক।

প্রসূতি তাঁহার নবজাত সন্তানসহ এই আঁতুড় ঘরে যে এক মাস কাল বাস করেন, এই সময়টাতে স্বভাবতঃই তাঁহাদিগকে বাড়ীর লোকদিগের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়। কঠিন পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিকে যেমন শয্যাগত থাকিয়া অপরের সেবা-শুশ্রূষার উপর নির্ভর করিতে হয়, প্রসূতির অবস্থাও ঠিক তাই। তখন প্রসূতির শরীর এরূপ দুর্ব্বল থাকে যে, তিনি তাঁহার কাজকর্ম্ম নিজেই করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। অপিচ, আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহার অনুসারে প্রসূতি নব প্রসূত সন্তান সহ বাড়ীর অপর সকল লোক হইতে এবং সকল কক্ষ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করিতে বাধ্য হ'ন। এক হিসাবে, ইহা মন্দ ব্যবস্থা নহে। সংক্রামক রোগাক্রান্ত রোগীকে

যেমন স্বতন্ত্র (segregate) করা দরকার, এও কতকটা তাই; এবং তাহা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানানুমোদিত বটে। কিন্তু, ইহার মধ্যে আরও একটু কথা আছে। কেবল স্বাস্থ্যনীতির অনুসরণ পূর্ব্বক segregateএর হিসাবে যদি প্রসূতিকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইত, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু, এই স্বতন্ত্রীকরণ ব্যাপারের সহিত একটু ঘৃণার ভাব মিশ্রিত থাকে বলিয়াই আমাদের আপত্তি। আঁতুড় ঘর এমন ঘৃণার জিনিষ যে, বাড়ীর কোন লোকে সহজে নিতান্ত দায়ে না পড়িলে, সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে বা প্রসূতি ও নব প্রসূত সন্তানকে স্পর্শ করিতে চাহেন না। এই ঘৃণার ভাব মিশ্রিত থাকাতেই, প্রসূতির পরিচর্য্যার ভার নাড়ী-কাটা দাইয়ের প্রেরিত একজন নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পণ করা হয়। যদি কোন কারণে, অথবা দৈবাৎ, বাড়ীর অপর কেহ সূতিকাগারে প্রবেশ করেন কিম্বা প্রসূতিকে স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তিনি অশুচি হ'ন; এবং তাঁহাকে স্নান করিয়া, গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া পুনরায় শুচি হইতে হয়। আর, ঐ সূতিকাগারের ঠিকা দাসীটিও এরূপ অস্পৃশ্যা যে, তাহাকে স্পর্শ করিলেও পূর্ব্বোক্ত মত স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবার ব্যবস্থা। এই ঘৃণার ভাব মিশ্রিত থাকাতেই, বাড়ীর মধ্যে যে কক্ষটি সর্ব্বাপেক্ষা নোংরা, অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে,—সহজ অবস্থায় লোকে যে কক্ষের চৌকাট মাড়াইতে সঙ্কুচিত হয়, সেই কক্ষটিই আঁতুড় ঘরের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। কোন কোন বাড়ীতে আঁতুড় ঘর অপর কক্ষগুলির সহিত সংস্রব রহিত ভাবে একটু দূরে দরমার অস্থায়ী বেড়া দিয়া এবং কোনরূপ একটু সামান্য আচ্ছাদন দিয়া নির্ম্মিত হয়। এরূপ স্থলে, পল্লী অঞ্চলে আঁতুড়-ঘর হইতে শৃগালে শিশু অপহরণ করিয়া লইয়া যায় বলিয়া শুনা আছে। অথচ, **বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহই আঁতুড় ঘর হওয়া উচিত।** অবশ্য তাহা সম্পূর্ণরূপে segregate করা হউক; তাহাতে কাহারও আপত্তি হওয়া উচিত নহে; তবে, সে কক্ষটি যেন অস্বাস্থ্যকর না হয়।

এদেশে শিশুদের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যা কিরূপ বেশী, তাহা আজকাল চিন্তাশীল সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। শিশুদের প্রায় এক বৎসর-বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বেশীর ভাগ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই শিশু-মৃত্যুর কারণ নানাবিধ। তন্মধ্যে প্রধান কারণ দুইটী—

(১) প্রায়ই প্রসব করাইবার জন্য অশিক্ষিতা কাণ্ডজ্ঞানশূন্যা হাড়ী ডোম জাতীয়া ধাত্রী নিযুক্ত করা হয়; এবং শিশুদিগের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, নাড়ী কাটিবার জন্য এই ধাত্রীরা যে অপরিষ্কৃত বাঁশের ছাল ব্যবহার করে, তদ্দ্বারা শিশুর দেহের রক্ত দূষিত হয় এবং তাহারা ধনুষ্টঙ্কার রোগে মারা যায়।

(২) আঁতুড় ঘরে শিশুর অযত্ন। অসহায় শিশুর জীবন-মরণের ভার যে অশিক্ষিতা নীচজাতীয়া স্বভাবতঃ নোংরা দাসীর হস্তে অর্পণ করা হয়, সদ্যোজাত শিশু-পালন সম্বন্ধে তাহার শিক্ষা-দীক্ষা যে কিরূপ তাহা জানিতে অবশ্য কাহারও বাকি নাই।

সন্তান প্রসবের পর জননীর শরীর সাধারণতঃ অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া থাকে। আর নবজাত শিশুর ত কথাই নাই; এই দুইটী প্রাণীকে এক মাস কাল কিরূপ সযত্নে সেবা-শুশ্রূষা করিতে হইবে, তাহা কি আবার বলিয়া বুঝাইতে হয়? অথচ, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, বাড়ীর অপর কাহারও সামান্য একটু সর্দ্দি কি জ্বর হইলে তাহার যেমন যত্ন হইয়া থাকে, নবপ্রসূতি বা নবজাত সন্তান সেই সামান্য সেবা-শুশ্রূষাতেও বঞ্চিত! তাহাদেরই অতিশয় অযত্ন সহকারে সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হয়! এই অযত্নের ফলে, নেহাত যাহারা ভাগ্যক্রমে উৎরাইয়া যায় তাহারা ছাড়া, প্রায়ই অধিকাংশ প্রসূতি ও শিশু পীড়িত হইয়া পড়ে। আঁতুড়েই যদি তাহাদের মৃত্যু নাও হয়, তথাপি, তাহাদের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল কমিয়া যায়।

এই সকল কারণে, আমাদের প্রাচীন কালের আর্য্য ঋষিগণ, এবং

আধুনিক কালের পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ্‌গণও সূতিকাগার এবং নবপ্রসূতি ও নবজাত সন্তানের সম্যক্ প্রকারে যত্ন লইতে উপদেশ দিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মতে সূতিকাগার নির্ম্মাণকালে অনেকগুলি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান পালন করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যে ভাবে আমাদের দেশে অধুনা সূতিকাগৃহ নির্দ্দিষ্ট বা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহাতে শাস্ত্রোপদেশ যে কতখানি পালিত হয় তাহা বলা বাহুল্য। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে বাটীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহ সূতিকাগার স্বরূপ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই কক্ষটি এমন হওয়া চাই যে, তাহাতে বায়ু ও রৌদ্র যথেষ্ট পরিমাণে খেলিবে; তাহা ভিজা, স্যাঁৎস্যেঁতে, অন্ধকার বা দুর্গন্ধময় হইবে না। সাধারণ ভাবেও তাহা স্বাস্থ্যকর হওয়া আবশ্যক এবং ব্যবহারের পূর্ব্বে এক বার চুনকাম করিয়া দেওয়ান উচিত। সেই গৃহ মধ্যে অন্য কোন তৈজস পত্র থাকিবে না।

সূতিকাগৃহকে বাটীর অন্যান্য কক্ষ হইতে সম্পূর্ণরূপে segregate করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই ব্যবস্থার সহিত অনেকটা ঘৃণার ভাব মিশ্রিত। ফলে, অশিক্ষিত লোকদের ক্রমে আসল বিষয় হইতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং ঘৃণার ভাবটাই প্রবল হইয়া উঠিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য এই ঘৃণার ভাব দূর করিয়া, প্রকৃত পক্ষে যে কারণে প্রসূতিকে স্বতন্ত্র রাখা দরকার (সংক্রামকতা নিবারণ), সেই দিকেই অধিক পরিমাণে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এইটা হইলে, প্রসূতির ও তাহার শিশুর আর বেশী অযত্ন হইতে পারিবে না। তাহা হইলে গৃহস্থ তাঁহাদের নবাগত বংশধর ও তাহার জননীর সেবা-শুশ্রূষার ভার নিম্ন শ্রেণীর অস্পৃশ্যা স্ত্রীলোকের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না।

সূতিকা গৃহের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি।

শয্যা ও বস্ত্র—প্রসূতি ও নবজাত শিশুর জন্য পৃথক শয্যার ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়। এই জন্য বড় তক্তাপোষ বা ছোট ও মাঝারি দুইখানি খাটিয়া সংগ্রহ করিবে। যাহারা উহা সংগ্রহ করিতে অক্ষম তাহারা মেজেতে প্রচুর পরিমাণে বিচালী ছড়াইয়া তদুপরি শয্যা রচনা করিবে। তক্তাপোষ বা খাটিয়া বা বিচালীর উপর একখানি পরিষ্কার কম্বল ও বিছানার চাদর থাকিবে। শিশুর জন্য ছোট ছোট চারি পাঁচ খানা কাঁথার বন্দোবস্ত রাখা দরকার। যাহাদের সংকুলান হয় তাহারা শিশুর জন্য ছোট একখানা অয়েল্ ক্লথ্ (Oilcloth) রাখিবেন। ইহাতে বারে বারে কাঁথা বদ্‌লাইতে হয় না। ভিজা কাঁথায় শিশুকে শয়ন করাইলে উহা তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর হইবে। প্রসূতি এবং শিশুর জন্য বস্ত্র পরিষ্কার থাকিবে। দরিদ্র পরিবারে ঐ কাপড় ৩।৪ দিন অন্তর সাবান ও সাজিমাটী দ্বারা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য।

অগ্নি—যাহাতে আতুর ঘরের মেজে ভিজা না থাকে তজ্জন্য ঘরে আগুন রক্ষার বন্দোবস্ত দরকার। প্রসূতি ও শিশু কাহারও পক্ষে ঠাণ্ডা লাগান উচিত নহে। প্রসূতির বিছানা হইতে অগ্নি কিছু দূরে রাখা কর্ত্তব্য। যেন আগুনের তেজ উহাদের শরীর স্পর্শ না করে অথচ যেন ঘর গরম থাকে। ঘরে যেন ধূম না হয় তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ তাহাতে শিশুর চক্ষে পীড়া হইতে পারে।

মাটির মালসা বা গামলা করিয়া কাঠের কয়লার আগুনই বেশ সুবিধাজনক। ইহা হইতে কোনরূপ ধূম বাহির হয় না এবং ঘরটীও বেশ গরম থাকে। আতুর ঘরে যতক্ষণ আগুন থাকিবে ততক্ষণই ঘরের মধ্য দিয়া বেশ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখিবে। এই জন্য জানলা বা দরজা খোলা থাকিবে। যখন জানলা দরজা বন্ধ করা আবশ্যক হইবে তখন ঘর

হইতে আগুন বাহির করিয়া দিবে। রাত্রে কদাচ ঘরের মধ্যে আগুন রাখিয়া প্রসূতি বা তাহার সেবাকারী নিদ্রা যাইবে না। ঘরে আগুন রাখিয়া জানলা দরজা বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া নিদ্রা যাইলে বিষাক্ত গ্যাস শুঁকিয়া (Carbon monoxide) বহু লোককে অজ্ঞান হইতে দেখা গিয়াছে এবং মৃত্যু হইয়াছে এরূপও জানা আছে।

পানীয় জল—পানীয় জল বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হওয়া উচিত। এই হেতু ফুটান জল প্রসূতির পক্ষে বিধেয়। জল ফুটাইয়া তাহা ফিট্‌কারী দ্বারা নির্ম্মল করিবে। ঐ জল শীতল হইলে প্রসূতিকে পান করিতে দিবে।

ঔষধ—গ্রামে যেখানে এলোপ্যাথিক ঔষধ বা চিকিৎসক দুর্ঘট তথায় দেশীয় ঔষধ সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। এবং কবিরাজের নির্দ্দেশ মতে উহা সেবন করা বিধেয়।

প্রসবের সময় অনেক প্রসূতি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তখন চিকিৎসকের মত লইয়া নাড়ী ক্ষীণ বোধ করিলে ২ ড্রাম ব্রাণ্ডি ১ আউন্স জল সহ সেবন করান যাইতে পারে। কিন্তু চিকিৎসকের উপদেশ ভিন্ন ইহা প্রসূতিকে দেওয়া বিপজ্জনক।

নিম্নলিখিত জিনিষ্ গুলি প্রসবের সময় প্রয়োজনীয় হইতে পারে।

(১) শিশুকে জড়াইয়া রাখিবার জন্য একখণ্ড ছোট কম্বলের ন্যায় গরম কাপড়।

(২) নাড়ী বাঁধার জন্য এক খণ্ড সূতা বা সরু ফিতা। পূর্ব্বে ইহা সিদ্ধ করিয়া পাত্র সহ ঢাকা দিয়া রাখিবে।

(৩) শিশুর চক্ষু মুছিবার জন্য এক খণ্ড স্পঞ্জ বা Boric তুলা ও খানিকটা বোরিক লোসন্ (Boric lotion) প্রস্তুত রাখিবে।

প্রসূতির যদি প্রদর রোগ থাকে সন্তান প্রসবের সময় তাহার পূঁয

শিশুর চক্ষে লাগিয়া উহার বিশেষ হানি করিতে পারে। এবং Ophthalmia Neonatorum রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে ভুগিয়া অনেকে জন্মান্ধ হইয়া থাকে। সেই জন্য প্রসব মাত্র Boric lotion দ্বারা শিশুর চক্ষু ধৌত করা উচিত এবং পরে Caustic lotion (Argentii Nitras (gr. ii to oz i) বা Argyrol Solution 10 per cent কয়েক ফোঁটা দুই চক্ষুতে দিবে।

(৪) কয়েকখানা পরিষ্কার ন্যাক্ড়া, কাপড় ও বিশুদ্ধ তুলা রাখিবে।

(৫) একখানি ছোট কাঁচি বা ধারাল অস্ত্র। নাড়ী কাটিবার জন্য ইহার প্রয়োজন হইবে। এইটীও সূতার সহিত সিদ্ধ করিয়া রাখিবে।

অন্যান্য দ্রব্য—আমাদের শাস্ত্রে আছে যে সূতিকা গৃহে ঘৃত, মধু, সৈন্ধব লবণ, সর্ষপ ও চাউলের কুঁড়া প্রভৃতি রাখা উচিত। গর্ভিণী যদি প্রসব বেদনায় কাতর হন তবে ভূর্জ্জপত্রের ধূম নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিবার বিধান আছে। স্থল বিশেষে এলাচ, কুঁড়া, ঈশালাঙ্গলী, বচ, চিতামূল, ডহরকরঞ্জার চূর্ণ আঘ্রাণ করারও ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালনে লাভ ভিন্ন হানি নাই।

পঞ্চম অধ্যায়।

নবজাত সন্তানের পরিচর্য্যা।

গত অধ্যায়ে আমরা আঁতুড় ঘর ও প্রসবের সময় কি কি শিশুর জন্য সাধারণতঃ আবশ্যক হইতে পারে তাহার আলোচনা করিয়াছি। এই অধ্যায়ে ভূমিষ্ঠ শিশুর পরিচর্য্যা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী বিষয় লেখা হইতেছে। প্রসবকালে প্রসূতির পরিচর্য্যা ও প্রসব ক্রিয়া ও প্রসবের পর প্রসূতির পরিচর্য্যা "প্রসূতিতত্ত্ব" নামক পুস্তকে সবিস্তারে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রসবের পর শিশুর শুশ্রূষা।

প্রসবের পর যতক্ষণ শিশু শ্বাস না টানিবে বা কাঁদিয়া উঠিবে ততক্ষণ নাড়ী কাটিবে না। প্রসব হইতে বিলম্ব হইলে শিশুরা শ্বাস টানে না বা কাঁদে না। এইরূপ অবস্থায় নাড়ী কাটিলে শিশু মারা যাইতে পারে।

নাড়ী কাটা ও বাঁধা—শিশু কাঁদিলে পর নাড়ী কাটিবে। শিশুর শরীর হইতে ১ ইঞ্চি দূরে রেশমের বা দৃঢ় সুতার দুইটী বাঁধন দিবে। পরে এই বাঁধন হইতে ১ অঙ্গুলি পরে ফুলের দিকে আর একটা বাঁধন দিবে। এই উভয় বাঁধনের মধ্যস্থলে ধারাল কাঁচি দ্বারা কাটিয়া ফেলিবে। এদেশে অজ্ঞ লোকেরা অপরিষ্কৃত অস্ত্র বা চাঁচাড়ি দ্বারা প্রায়ই নাভি রজ্জু কাটিয়া থাকে। এই রূপ অপরিষ্কৃত ভাবে নাড়ী কাটার ক্ষত দিয়া ধনুষ্টঙ্কার বীজাণু শিশুর দেহে প্রবেশ করে এবং ৫।৭ দিনের মধ্যে ধনুষ্টঙ্কার রোগে (Tetanus Neonatorum) শিশুটী মারা যায়। এইরূপে যে কত শিশু অকালে মারা যায় তাহার ইয়ত্তা নাই।

চক্ষুর যত্ন—যোনি গহ্বর হইতে শিশুর কপাল ও চক্ষু বাহির হইলেই তাহা বোরিক লোসনে আর্দ্র করা মিহি পরিষ্কার কাপড় বা তুলা দ্বারা

পুছাইয়া লইবে। প্রত্যেক চক্ষুকে পৃথক ভাবে এইরূপ পুছান আবশ্যক। যদি প্রসূতির দূষিত প্রদরের পীড়া থাকে তাহা হইলে বেশ করিয়া শিশুর মুখমণ্ডল পরিষ্কার করিয়া পরে দুই চক্ষে Argenti nitras solution বা Argyroll lotion ফোঁটা করিয়া দিবে। স্নানের পর যখন শিশুকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে তখন শিশুর হাত দুই খানিও এই সঙ্গে আবদ্ধ রাখিবে কারণ হস্ত সঞ্চালন দ্বারা শিশু পুনঃ পুনঃ চক্ষুকে বিষাক্ত বীজাণু দ্বারা দুষ্ট করিতে পারে না।

শিশুর স্নান ও গাত্র মুছান—গর্ভাবস্থায় শিশুর গাত্রে এক প্রকার আটাল পদার্থ (Vernix caseosa) লাগিয়া থাকে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাহা সাবধানে ধৌত করিবে। সরিসা বা নারিকেল তৈল অল্প পরিমাণে গাত্রে লাগাইয়া ঈষদুষ্ণ জলে নাকড়া বা স্পঞ্জ ভিজাইয়া সাবধানে গাত্র পরিষ্কার করিলে, এই মল উঠিয়া যায়। উৎকৃষ্ট সাবান দ্বারাও এই কার্য্য হইতে পারে। ঈষদুষ্ণ জলে গা ধোওয়া শেষ হইলে, পরিষ্কৃত গামছা বা নরম তোয়ালে দ্বারা আস্তে আস্তে শিশুর সকল গাত্র ঘষিষা পুছাইয়া দিবে। গা মোছাইবার কালে শিশুর শরীর মর্দ্দন করিবে না। সংযোগ স্থান গুলি ধীরে ধীরে চাপিয়া চাপিয়া ভাল করিয়া পরিষ্কার ও শুষ্ক করিবে ও সে স্থানে Nursery powder লাগাইয়া দিবে। নাসিকা ও কর্ণমূল সাবধানে মুছাইয়া দিবে।

শিশুর স্নান ও গাত্র মুছান শেষ হইলে নাভিরজ্জুর টুকরাটিতে বেশ করিয়া পাউডার লাগাইবে এবং ৪ ইঞ্চি চতুষ্কোণ পরিষ্কার মিহি কাপড়ের মধ্য থানে ছেদ করিয়া এই নাড়ী রজ্জুটাতে গলাইয়া দিবে। পরে এই কাপড় খণ্ডে নাভিরজ্জু বেশ করিয়া ঢাকিয়া পেটের সহিত বাঁধিয়া দিতে হইবে। এই প্রকারে প্রত্যহ যে পর্য্যন্ত না নাভি খসিয়া পড়ে ড্রেস করিতে হইবে।

এইরূপে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া উপযুক্ত বস্ত্রাবৃত করিয়া শিশুকে

পৃথক শয্যায় রাখিতে পারিবে। যদি শিশুটী দুর্ব্বল হয় বা হাত পা ঠাণ্ডা থাকে তাহা হইলে তাহার শয্যার পার্শ্বে গরম জলের বোতল রাখিয়া দিবে।

মলমূত্র—ভূমিষ্ঠ হইবার পর কয়েক দিন পর্য্যন্ত শিশু গাঢ় সবুজবর্ণ নরম ও আটাযুক্ত মল (Meconium) ত্যাগ করে। এই মল পিত্ত সংযোগে এইরূপ বর্ণযুক্ত হইয়া থাকে। অনেক সময়ে ইহা শিশুর চর্ম্মে প্রদাহ উপস্থিত করে; এই জন্য মলদ্বারের নিকট কিছু তৈল লাগাইয়া রাখা বিধেয়।

ভূমিষ্ঠ হইবার কিছু পরেই শিশু মূত্র ত্যাগ করে। অনেক সময় এই মূত্র অলক্ষিত ভাবে পরিত্যক্ত হয়। কোনরূপ চিকিৎসা ব্যবস্থার পূর্ব্বে শিশুকে কয়েক ফোটা করিয়া জল খাইতে দিবে। যদি এরূপ জল খাইয়াও প্রস্রাব না হয় তাহা হইলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে।

সুস্থ শিশু প্রত্যহ তিন চারিবার মলত্যাগ করিবে এবং অনেক বার প্রস্রাব করিবে। তৃতীয় দিনের পর হইতেই মল বেশ হরিদ্রাবর্ণ ও পাতলা হয়। শিশু তিন চারিবার মলত্যাগ করিলেই বেশ সুস্থ ও সবল থাকে।

এই অতি শৈশবাবস্থা হইতেই শিশুকে নিয়মিত অভ্যাস (Regular Habits) শিক্ষা দিতে হইবে। এবং ঠিক মত এই শিক্ষা বিষয়ে যত্ন লইলে শিশুরাও আশ্চর্য্যরূপে তাহাতে অভ্যস্ত হয়।

শিশুরা প্রস্রাব ত্যাগ করিলেই কটিবন্ধের কাপড় ভিজিয়া যায় এবং তাহারা ক্রন্দন করিয়া তাহার জানান দেয়। তৎক্ষণাৎ সেই ভিজা কাপড় পরিবর্ত্তন করা উচিত।

এইরূপে শিশুর প্রথম হইতে অভ্যাস তৈয়ারি করাইতে হইবে। যদি প্রস্রাবে ভিজা কাপড় অধিকক্ষণ শিশুর গাত্রে সংলগ্ন থাকে তাহা

হইলে সেই স্থান হাজিয়া যাইতে পারে ও নানারূপ চর্ম্মরোগ হইতে পারে।

শিশুর কাপড়—শিশুর Napkin খুব নরম কাপড়ের হওয়া আবশ্যক। কোনরূপ ক্ষার বা সোডা না দিয়া ইহা ধৌত করিবে। এবং বেশ করিয়া হাওয়াতে শুষ্ক করিবে।

পরিচ্ছদ—খুব হালকা ও গরম হওয়া উচিত। ইহাদের প্রায়ই পরিবর্ত্তন করিবে। মল-মূত্র লাগিলে তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

বিশুদ্ধ বায়ু—ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই শিশুর বিশুদ্ধ বায়ুর আবশ্যক হয়। ইহাকে বেশ করিয়া বস্ত্রাবৃত করিয়া মুক্ত বায়ুতে রাখিয়া দিলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই এবং মুক্তবায়ু শিশুকে বল ও তেজ প্রদান করে এবং ইহার ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। শিশুর শয্যাটী কোন আবৃত মুক্ত স্থানে প্রসবের কয়েক দিন পর হইতে দিবাভাগে রাখা উচিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শিশুর খাদ্য।

উপযুক্ত ভাবে সন্তান পালন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে যত্নবান হওয়া আবশ্যক। ভগবান প্রত্যেক জীবের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পালনের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন। শিশুর জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মাতৃস্তনে অমৃতধার স্বরূপ দুগ্ধ প্রদান করিয়াছেন। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর সদ্যোজাত শিশু এই দুগ্ধ দ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়।

মাতৃস্তন্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। অন্য কোন পদার্থই শিশুর শারীরিক গঠন কল্পে মাতৃদুগ্ধের সমতুল্য নহে। প্রসূতির শরীর সুস্থ থাকিলে, শিশুর শরীর গঠনোপযোগী সমস্ত উপাদানই মাতৃস্তন্যে বর্ত্তমান থাকে; এবং শিশু সাত মাস বয়স পর্য্যন্ত একমাত্র মাতৃস্তন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে। নিতান্ত অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত মাতা কখনই শিশুকে স্তন্যদানে বিরত হইবেন না। কারণ, কৃত্রিম খাদ্য-পালিত শিশুর স্বাস্থ্য কোনক্রমেই মাতৃস্তন্য-পালিত শিশুর স্বাস্থ্যের সমতুল্য হইতে পারে না। গর্ভাবস্থায় মাতার শোণিত হইতেই শিশুর দেহ গঠিত হইয়া থাকে। মাতৃস্তন্যও সেই শোণিতেরই রূপান্তর মাত্র। গর্ভে বাস কালে শিশু মাতার শোণিত হইতে তাহার রক্তকণিকা, তাহার মাংস, তাহার মেদ, তাহার অস্থি গঠনের উপাদান সংগ্রহ করিয়া বর্দ্ধিত হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পর সে মাতৃস্তনদুগ্ধ হইতে এই সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিলাভ করে। মানুষের অপর কোন খাদ্যে একাধারে

এইরূপ ভাবে শিশুশরীর গঠনোপযোগী সমস্ত উপাদান বর্ত্তমান থাকে না। এইজন্য জগদীশ্বর শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাতৃস্তন্যে তাহার আহার্য্য যথেষ্ট পরিমাণে যোগাইয়াছেন।

মাতৃস্তন্যের আরও অনেক গুণ আছে। স্তন্যপায়ী জীব মাত্রেই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রথম দিনকতক কেবল মাত্র মাতৃদুগ্ধের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, এবং পরে, উপযুক্ত সময়ে অন্য খাদ্যাদি গ্রহণ করিতে শিখে। ইহাই প্রকৃতির সাধারণ এবং স্বাভাবিক নিয়ম। এই জন্য প্রকৃতি দেবী মাতৃস্তন্যকে শিশুপালনের সর্ব্বতোভাবে উপযোগী করিয়া রাখিয়াছেন।

মাতৃস্তন দুগ্ধের বিশেষত্ব।

ইহা ছাড়াও মাতৃস্তন্যের আরও এমন কতকগুলি গুণ আছে, যাহা অন্য কোন খাদ্যে নাই। স্তনদুগ্ধে রোগপ্রতিষেধক পদার্থসমূহ (Vitamines) বর্ত্তমান থাকে; এজন্য মাতৃস্তনদুগ্ধ-পালিত শিশু কৃত্রিম-খাদ্য-পালিত-শিশুর অপেক্ষা কম রোগাক্রান্ত হয়। স্তনদুগ্ধে লেসিথিন (Lecithin) নামক একপ্রকার স্নেহজাতীয় উপাদান আছে। লেসিথিন মস্তিষ্কাদি গঠনের জন্য বিশেষ আবশ্যক। নারী দুগ্ধের তুলনায় অন্য সকল প্রাণীর দুগ্ধেই লেসিথিনের পরিমাণ কম। স্তনদুগ্ধে কোন প্রকার বীজাণু স্বভাবতঃই থাকে না; এবং শিশু মাই চুষিয়া দুধ খায় বলিয়া, বাহির হইতে কোন রোগ-বীজাণু মাতৃদুগ্ধকে আশ্রয় করিয়া শিশুর অনিষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু নিতান্ত সাবধানতা অবলম্বন না করিলে, কৃত্রিম খাদ্যের সহিত বহুসংখ্যক বীজাণু শিশুর শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এই কারণে কৃত্রিম-খাদ্য-পালিত শিশুর উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মে।

শিশুর পরিপাক শক্তির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে স্তনদুগ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত মাতৃস্তন্যেরও ক্রমিক পরিবর্ত্তন হইয়া

থাকে। এক মাসের শিশুর পক্ষে যে খাদ্য উপযোগী, ৮।৯ মাস বয়স্ক শিশুর পক্ষে সে খাদ্য উপযোগী হইতে পারে না।

কৃত্রিম খাদ্যে শিশুর পরিপাক শক্তির ক্রমবিকাশের কিছুই সুবিধা হয় না। এজন্য কৃত্রিম-খাদ্য-পালিত শিশু বড় হইলে অজীর্ণ রোগ দ্বারা প্রায়ই আক্রান্ত হইয়া থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরই মাতৃস্তনে প্রথম দিনকয়েক যে দুগ্ধ আসে, তাহা পরবর্ত্তী কালের দুগ্ধের অনুরূপ নহে। এই দুগ্ধ সদ্যোজাত শিশু অতি সহজেই পরিপাক করিতে পারে, এবং ইহাতে শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কারের সহায়তা হইয়া থাকে।

শিশুর জন্মগ্রহণের পর হইতে প্রথম ছয় সাত মাস কাল মাতৃস্তন্যই যখন শিশুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং স্বাভাবিক খাদ্য, তখন, প্রত্যেক প্রসূতির দেহে এই খাদ্য কিরূপ অবস্থায় থাকে, তাহা সর্ব্বাগ্রে নির্ণয় করিতে হইবে। প্রসূতির শারীরিক অবস্থা তাহার নবজাত সন্তানকে স্তন্যদানে পালন করিবার উপযোগী অবস্থায় না থাকিলে, তাহার পক্ষে সন্তান পালনের চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

মাতৃস্তন দুগ্ধের উপাদান।

সুস্থদেহ নারীর স্তনদুগ্ধ ঈষৎ নীলবর্ণাভ; তাহা হইতে সামান্য জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইয়া থাকে। উহার স্বাদ মিষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দেখিলে উহার উপর সমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাখন-কণা ভাসমান দেখা যায়।

১। জল, (water) শতকরা ৮৫ হইতে ৯০ অংশ।

২। স্নেহজাতীয় মাখন (Fat) প্রায় প্রোটীডের সহিত সম্মিলিত ও ঘনীভূত ভাবে থাকে। ইহার অংশ শতকরা ৩ হইতে ৫; অথবা গড়ে ৪। মাতৃদুগ্ধ কিছুক্ষণ স্থির ভাবে রাখিয়া দিলে মাখনের অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া উপরে ভাসিতে থাকে।

৩। শালীজাতীয় চিনি (Sugar)। মাতৃদুগ্ধের কার্ব্বোহাইড্রেড

অংশের নাম ল্যাক্টোজ। ইহার অপর একটী পর্য্যায় মিল্ক-সুগার। মাতৃদুগ্ধে ইহা শতকরা ৬ হইতে ৭ অংশ পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে।

৪। মাতৃদুগ্ধের আমিষ জাতীয় প্রোটীড (Proteid) তিন প্রকার— কেসেইন (Casein) এবং ল্যাকটালবুমিন ও ল্যাক্টগ্লোবিউলিন (Lactalbumin and Lactglobulin) আকারে থাকে। Lactalbumin ও Lactglobulin দ্রব অবস্থায় থাকে বলিয়া, সর্ব্বাগ্রে পরিপাক হইয়া শোষিত হয়; ইহাদের পরিমাণ কেসেইনের প্রায় দ্বিগুণ এবং ইহারা শিশুর পাকস্থলীতে জমাট বাঁধে না। কেসেইন মাতৃদুগ্ধে মাঝখানে ভাসমান থাকে এবং শীঘ্রই থিতাইয়া পড়িতে পারে। মাতৃস্তন্যে য়্যাসেটিক য়্যাসিড মিশ্রিত করিলে যে দধিবৎ পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত গোদুগ্ধজাত দধির অনেকটা পার্থক্য আছে। মাতৃস্তন্যে প্রোটীডের পরিমাণ শতকরা ১ হইতে ২ অংশ বা গড়ে ১.৫ অংশ।

যদি দুগ্ধে আমিষ অংশ স্বাভাবিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে দুগ্ধ উত্তম বিবেচিত হয়। যদি ইহাদিগের অংশ বেশী হয় তাহা হইলে সেই দুগ্ধকে খারাপ বিবেচনা করা হয়।

৫। লবণ। মাতৃদুগ্ধে প্রধানতঃ ক্যালসিয়ম ফসফেট এবং পটাসিয়ম কার্ব্বনেট—এই দুইটি লবণ দেখা যায়। এই দুইটির মোট পরিমাণ শতকরা ০.২ মাত্র।

মাতৃদুগ্ধের উপাদানের তারতম্য—অতি উৎকৃষ্ট স্তন দুগ্ধেও উপাদানের অল্প বিস্তর তারতম্য দেখা যায়। দিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্তন দুগ্ধের পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু এই পার্থক্য বেশী হওয়া উচিত নহে। আমিষ শতকরা ১ ভাগের কম হইবে না ও তিন ভাগের বেশী হইবে না, স্নেহ জাতীয় ৩ ভাগের কম ও ৫

ভাগের বেশী হইবে না, শালি জাতীয় ৬ হইতে ৭ ভাগের মধ্যে এবং লবণ ০·১ হইতে ০০·২ এর মধ্যে হইবে।

উপরিলিখিত অংশের বিশেষ কম বেশী হইলে শিশুর পুষ্টির ক্ষতি হইয়া থাকে এবং এই দোষের প্রতিকার চেষ্টা করা আবশ্যক।

মাখনের তারতম্য—দুগ্ধে মাখনেরই বেশী তারতম্য দেখা যায়। দুগ্ধ প্রদানের শেষাবস্থায় অর্থাৎ প্রায় ৯ মাস গত হইলে মাখনের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পাইয়া থাকে, এমন কি ২ ভাগ অথবা তদপেক্ষা আরও কমিয়া যায়।

আমিষের তারতম্য—আমিষের পরিমাণ ও জাতিগত পার্থক্য দেখা যায়। মাতার পরিশ্রম না থাকিলে দুগ্ধে আমিষের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। খাওয়ার মাত্রা কমাইয়া ও পরিশ্রমের মাত্রা বাড়াইয়া দুগ্ধে অতিরিক্ত আমিষ ভাগ কমান হইয়াছে এরূপ ঘটনাও জানা আছে। মানসিক উত্তেজনার দ্বারাও দুগ্ধে আমিষের ভাগ বৃদ্ধি পায়। আমিষের মাত্রা ৪ কিম্বা তদপেক্ষাও কিছু বেশী হওয়া অদ্ভুত নয়। উপযুক্ত পুষ্টিকর দ্রব্য আহারের সহিত মাতার স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়ম পালনের কোন একটীর ব্যতিক্রম ঘটিলে স্তনদুগ্ধে আমিষের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং এরূপ দুগ্ধে শিশুর পেটের অসুখ বা অন্য প্রকারে স্বাস্থ্য হানি হইতে পারে। যে স্তনদুগ্ধে সকল সময়েই ৩ ভাগের অধিক আমিষ উপাদান থাকে তাহা ভাল নহে। মধ্যে মধ্যে আমিষ উপাদানের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

শর্করার তারতম্য—দুগ্ধে শর্করার তারতম্য প্রায় দেখা যায় না। ইহা সকল অবস্থাতেই সমভাবে বর্ত্তমান থাকে।

মাতৃদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ।

মাতৃস্তন্য কেন যে শিশুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য, গোদুগ্ধের সহিত মাতৃস্তন্যের একটুখানি তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। মাতৃস্তন্যে দুগ্ধের ধাতব অংশ গোদুগ্ধের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শিশুর দেহে

শোষিত হইবার উপযোগী অবস্থায় থাকে। গোদুগ্ধের অপেক্ষা মাতৃস্তন্যে প্রোটীডের অনুপাতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ক্ষারের অংশ থাকায় উহা শিশুর শরীর গঠনে বেশী পরিমাণে সহায়তা করিয়া থাকে। মাতৃস্তন্যে প্রোটীডের অংশ কম। কিন্তু অধিক পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার মাখনের অংশ এমন অবস্থায় থাকে, যাহা শিশুর দেহে শীঘ্র শোষিত হয়। গোদুগ্ধ হইতে শিশু কিছু বেশী পরিমাণে প্রোটীড পায় বটে, কিন্তু উহাতে, মাখনের অংশকে জীর্ণ করিবার উপযোগী, এবং তাহা হইতে কোষ গঠনের উপযোগী, ক্ষার যথেষ্ট পরিমাণে পায় না। এই জন্য গোদুগ্ধে প্রোটীডের অংশ বেশী থাকিলেও, তাহাতে শিশুর দেহের বেশী উপকার হয় না।

মাতৃস্তন দুগ্ধের ত্রুটি।

তবে মাতৃস্তন্যের একটা ত্রুটিও আছে। উহাতে চূণের অংশ নিতান্ত কম। এই জন্য শিশু মাতৃদুগ্ধের উপর ছয়মাস কাল নির্ভর করিতে পারে, তাহার বেশী আর পারে না। ছয় মাসের পরও শিশুকে কেবল মাতৃস্তন্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইলে, তাহার অস্থিগঠন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, অস্থি দুর্ব্বল বলিয়া যে শিশু Rickets রোগে ভুগিতেছে, তাহার জননীর দুগ্ধে চূণের মাত্রা অত্যন্ত কম। একটা কুকুর, যাহার বাচ্ছা হইয়াছে, এবং যে বাচ্ছা এখনও মাই ছাড়ে নাই,—তাহার উপরও এই পরীক্ষা হইয়াছে। ঐ কুকুরটিকে এমন খাদ্য দেওয়া হইতে লাগিল, যাহাতে চূণের অংশ মোটেই নাই। ফলে, কিছু দিন বাদে দেখা গেল, তার বাচ্ছাগুলির মানব-শিশুর মতই রিকেটস (Rickets) রোগ হইতে আরম্ভ হইল। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, মাতৃস্তন্যে চূণের অংশ কম থাকিলে শিশু Rickets রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ, দুগ্ধের পরিমাণ অর্থাৎ ওজন নির্ণয় করিতে হইবে। ছেলেকে মাই দিবার সময়-বরাবর প্রসূতির স্তন দুইটী দুগ্ধে ভর্ত্তি হইয়া আসে। তখন মাই সুড় সুড় করে, এবং ছেলেকে মাই দিবার জন্য মায়ের মনে স্বতঃই প্রবল ইচ্ছা হয়। এইরূপ অবস্থা হইলে বুঝিতে হইবে, মাই দুটীতে পূর্ণ দুগ্ধের সঞ্চার হইয়াছে। এই দুধটুকু সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করিয়া ওজন করিয়া লইলেই দুগ্ধের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে। মাই হইতে দুধ বাহির করিয়া লইবার জন্য কাচের একপ্রকার 'পাম্প' আছে। কিন্তু এই উপায়ে সবটা দুধ বাহির হয় না, সেইজন্য দুগ্ধের পরিমাণও ঠিকমত নির্দ্ধারিত হয় না। দুগ্ধ ওজন করিবার আরও একটী সদুপায় আছে। অতি সূক্ষ্ম ও নিখুঁত ভাবে ওজন করিবার কল (weighing machine) পাওয়া যায়। শিশু মাই খাইবার পূর্ব্বে তাহাকে এই যন্ত্রে ওজন করিয়া লইতে হইবে; এবং দুধ খাইবার পরও একবার ওজন লইতে হইবে। তাহাতে দেখা যাইবে, প্রথম বার শিশুর ওজন যত হইয়াছিল, দ্বিতীয় বার তাহার ওজন তদপেক্ষা বেশী হইয়াছে। এই বেশী অংশটা দুগ্ধের ওজন। এইরূপে বার তিন-চার শিশুর দুগ্ধপানের আগে পিছে তাহাকে ওজন করিয়া লইলে যে গড় পড়তা ওজন দাঁড়াইবে, সেটা প্রায় মাই দুধের ঠিক ওজন।

মাতৃস্তন দুগ্ধের পরিমাণ নির্ণয়।

তার পর, দুধের গুণ কিরূপ অর্থাৎ উহা কি পরিমাণে পুষ্টিকর তাহা ঠিক করিতে হয়। যাহার স্তনের কোষগুলি (glands) বেশ পুষ্ট ও আকারে বৃহৎ, তাহার দুগ্ধও সেই পরিমাণে পুষ্টিকর। সন্তান প্রসব করিবার পর যে সকল প্রসূতির স্তন অল্প দিনের মধ্যে ঝুলিয়া পড়ে, সহজেই বুঝা যায় তাহাদের স্তনের glandগুলি দুর্ব্বল, এবং তেমন পুষ্টও নয়। এইরূপ স্তনে ভাল দুধও জন্মিতে পারে না। কিন্তু সন্তান

দুগ্ধের গুণ ও স্তনের পুষ্টি।

প্রসব করিবার পরও যাহাদের স্তন আকারে, মোচার ডগার মত এবং যথাসম্ভব নিরেট থাকে—যাহা আকারে খুব বড় নয়, এবং যাহাতে চর্ব্বির ভাগ খুব কম, সেই স্তন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; তাহার glandগুলি বেশ পুষ্ট; তাহাতে ভাল দুধও জমিয়া থাকে।

মাতার স্তনের দুগ্ধের পরিমাণ নির্ণয় করিবার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল, শিশু স্তন হইতে যে দুধ পাইবে, তাহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে কি না, তাহাই দেখা। কিন্তু ইহার মধ্যে আরও একটু কথা আছে। এই সঙ্গে শিশুর, মাতার স্তন হইতে দুধ টানিয়া লইবার ক্ষমতার কথাটাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। শিশু যদি ক্ষীণকায়, দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে, তাহার জননীর স্তনে যথেষ্ট দুধ থাকিলেও সে সর্ব্বদা দুধ টানিয়া লইতে পারে না ; এবং তাহার ফলে তাহার দেহ উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টি-লাভ করিতে পারে না। আবার, সন্তান বেশ হৃষ্টপুষ্ট সবল হইলে টানিয়া টানিয়া অনেকটা দুধ বাহির করিয়া লইতে পারে ; এবং টানের মুখে যোগান দিবার জন্য মাতার স্তনে বেশী পরিমাণে দুধ জমিতে পারে।

এরূপ স্থলে , বেশী দুধ সরবরাহ করিয়া প্রসূতি যাহাতে শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে না পারে, এই জন্য, প্রসূতিকে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। অতএব, প্রসূতির স্তনে দুগ্ধের পরিমাণ কিরূপ তাহা স্থির করা আবশ্যক বটে, কিন্তু তাহা না করিলেও যে বিশেষ কোন ক্ষতি হয়, তাহাও নহে।

বহু-সন্তানের জননী সন্তান প্রসব করিতে করিতে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া আসে। তখন সে আর রীতিমত তাহার সন্তানকে স্তন্য দিয়া পালন করিতে পারে না। কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলে, চিকিৎসায় যদি রোগী নির্দ্দোষ রূপে আরোগ্য লাভ করিতে না পারে, তাহার শরীরে যদি পুনরায় উত্তম-রূপ বলাধান না হয়, তাহা হইলেও জননী সন্তানকে রীতিমত পালন করিতে অক্ষম হইয়া থাকে।

প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ নিতান্ত কম হইলে অথচ তাঁহার শরীর সুস্থ থাকিলে, তিনি যদি একটু আধটু ব্যায়াম করেন, কিম্বা অল্প-শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে দুধ বাড়িতে পারে। অল্পস্বল্প পরিশ্রমে বা ব্যায়ামে দুগ্ধে প্রোটিডের পরিমাণ কমিয়া যায়। সুতরাং দুগ্ধে প্রোটিড প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে থাকিলে ব্যায়াম করায় উপকার আছে।

বিকৃত স্তনদুগ্ধ।

যে জননী সন্তানকে স্তন্য দিয়া পালন করিতেছেন, তিনি সর্ব্বদা প্রসন্ন মনে থাকিবার চেষ্টা করিবেন। তাঁহার কোনরূপ মানসিক বিকার ঘটিলে, স্তনদুগ্ধ অতি শীঘ্র বিকৃত হইয়া যায়, এবং সেই দুগ্ধ পান করিলে শিশুর পীড়িত হইবার খুবই সম্ভাবনা আছে। অতিমাত্রায় ক্রোধ, শোক, ভয়, কামনা, উত্তেজনা, ক্লান্তি প্রভৃতি স্তন দুগ্ধের উপর খুব বেশী পরিমাণে ক্রিয়া করিয়া থাকে, এবং তাহার ফলে দুগ্ধ বিষাক্ত হইয়া উঠে। এইরূপ দুগ্ধ পান করিলে শিশুর যদি তৎক্ষণাৎ মৃত্যু নাও হয়, তথাপি, তাহার অজীর্ণতা, প্রভৃতি লক্ষণ নিশ্চয়ই প্রকাশ পায়।

প্রসূতির, কিম্বা দুগ্ধপোষ্য শিশুর পীড়া হইলে সময়ে সময়ে প্রসূতিকে ঔষধ দেওয়া আবশ্যক হয়। সন্তান জন্মগ্রহণ করিবার পর নব-প্রসূতিকে ঔষধ দেওয়া যায়। কিন্তু তাহা খুব বিবেচনা করিয়া সাবধানে দেওয়া উচিত। সকল ঔষধ প্রসূতির স্তন্যসহ শিশুর দেহে সঞ্চারিত হয় না; কোন কোন ঔষধ হয়। যে গুলি হয় তাহাদের মধ্যে এলকোহল, অহিফেন, এট্রোপাইন, ক্লোরাল এবং আইওডাইড শ্রেণীর ঔষধ উল্লেখ-যোগ্য। শিশুর যদি এই সকল ঔষধের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে প্রসূতিকে এই সকল ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। কিন্তু যদি এই সকল ঔষধের শিশুর দেহে অনিষ্ট করিবার সম্ভাবনা থাকে, তবে ইহা প্রসূতিকে সেবন করানো উচিত নহে।

প্রসূতির দুগ্ধে কোন্ উপাদান কি পরিমাণে আছে, যন্ত্র সাহায্যে

তাহা নির্ণয় করিয়া, এবং শিশুর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া, স্তনদুগ্ধের উপর শিশু সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারে কি না, তাহা দেখিতে হইবে। শিশু-শরীর পরীক্ষায় দুগ্ধের যে যে উপাদান তাহার যে পরিমাণে দরকার বলিয়া বোধ হইবে, দুগ্ধে সেই সেই উপাদান সেই পরিমাণে থাকিলেই প্রসূতি ঠিকমত সন্তানকে পালন করিতে পারিবেন। প্রয়োজনের অনুপাতে উপাদানগুলির ইতরবিশেষ ঘটিলে, প্রসূতির আহারের তদারক করিয়া যদি সামঞ্জস্য ও সমন্বয় ঘটানো সম্ভবপর হয়, তবে তাহাই করিতে হইবে; নচেৎ, প্রসূতির হাত হইতে সন্তান পালনের ভার অপর ধাত্রীর হাতে দিতে হইবে; কিম্বা কৃত্রিম খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

স্তন দুগ্ধই যে শিশুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক খাদ্য, তাহার একটা প্রধান কারণ, সাধারণতঃ স্তনদুগ্ধ রোগবীজাণুশূন্য। প্রসূতির যদি কৌলিক কোন রোগ থাকে, কিম্বা তাহার নিজের শরীরেই যদি কোন গুরুতর ব্যাধি থাকে তাহা হইলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা; এরূপ স্থলে তাহার দুগ্ধে রোগবীজাণু থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু সাধারণতঃ তাহার শরীর সুস্থ থাকিলে তাহার দুগ্ধ শিশুর পক্ষে খুব নিরাপদ খাদ্য।

সচরাচর ২০ হইতে ৩৫ (কেহ কেহ বলেন ৪০) বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা স্তন্য দিয়া শিশু পালন করিতে সমর্থ। ইহা বিলাতের কথা—সেখানে মেয়েদের একটু বেশী বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে আরও একটু পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪।১৫ বৎসর বয়স হইতেই মেয়েরা গর্ভধারণ করে, ও সন্তান পালন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র মতে ২০ হইতে ৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই স্তনের দুগ্ধ খুব উত্তম অবস্থায় থাকে, এবং তাহাতে ননীর পরিমাণও বেশী থাকে। হৃষ্টপুষ্ট সবল সুস্থকায় স্ত্রীলোক যে তাহার শিশুকে যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ সরবরাহ করিতে পারে এ কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু তথাপি দেখা যায়, অনেক ক্ষীণকায় কিন্তু সুস্থদেহ স্ত্রীলোক বেশ সন্তান পালন করিয়া থাকে।

শিশু মাই ছাড়িবার পূর্ব্বে তাহার জননী পুনরায় ঋতুমতী হইলে তাহার দুগ্ধের গুণের সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। তবে তাহা ঋতুর প্রথম দুই একদিন মাত্র। এই সময়ে দুগ্ধের পরিমাণ কিছু কম হয়, আর, তাহাতে পুষ্টিকর পদার্থও কম থাকে। তবে এই অবস্থা অল্প সময়ের জন্য, ইহাতে শিশুর বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধির আশঙ্কা নাই। বিশেষতঃ, শিশুর বয়স ছয়মাস না হইলে তাহার জননী প্রায়ই পুনরায় ঋতুমতী হয় না। তত দিনে শিশুকে গোদুগ্ধ অল্প অল্প দেওয়া হইয়া থাকে। তবে ঋতুর পর স্ত্রীলোকটী যদি পুনরায় গর্ভবতী হয়, তাহা হইলে দুগ্ধের পরিমাণ ত কমিয়া যায়ই,—কারণ, যে শোণিত দুগ্ধে পরিণত হইত, তাহা তাহার গর্ভস্থ ভ্রূণের পোষণার্থ নিয়োজিত হয়; অধিকন্তু, তাহার গুণেরও বহু পরিমাণে ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকে। এই কারণে, গর্ভ হইলে আর শিশুকে তাহার মাই খাইতে দেওয়া উচিত নহে। আমাদের দেশীয় লোক-ব্যবহারেও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধ তাহার কোলের শিশুকে খাইতে দেওয়া হয় না।

এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া, জননী শিশুকে পালন করিবার উপযুক্ত বলিয়া স্থির হইলে, তবেই তিনি শিশুর লালন-পালনের ভার লইতে পারেন। কিন্তু এই অবস্থাগুলি বিবেচনা করিবার সময়ে যদি কোনরূপ সন্দেহ বা অ-স্থিরতা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, জননী শিশুকে পালন করিতে পারিবেন কি না, তাহা কিছু দিন পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। অর্থাৎ জননীর হাতে শিশুর লালন-পালনের ভার অর্পণ করিয়া, শিশুর স্বাস্থ্যের অবস্থা ঠিকমত উন্নত হইতেছে কি না, তাহার ওজন বাড়িতেছে কি না, মস্তিষ্ক গঠন সম্পূর্ণ হইতেছে কি না।—এই সমস্ত বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জননীর স্বাস্থ্য শিশুর লালন পালন ভার গ্রহণের উপযোগী, ইহা চিকিৎসকের পরীক্ষায় স্থির হইয়া গেলে, তাঁহার উপর যখন শিশুর লালন

পালনের ভার অর্পণ করা হইবে, তখন শিশুকে সম্পূর্ণরূপেই মাতৃস্তন্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

স্তনদুগ্ধ দিবার ব্যবস্থা—

ইতর প্রাণীদিগের সন্তানকে স্তন দান সম্বন্ধে কোনপ্রকার বিবেচনা শক্তি না থাকিলেও তাহারা স্বাভাবিক ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সন্তানকে পালন করে। রমণীদিগের মধ্যে স্বাভাবিক ইচ্ছা স্নেহ-মমতা প্রভৃতি সভ্যজগত নানা কারণে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই জন্য কেবলমাত্র মাতা নিজ স্বাভাবিক ইচ্ছা শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিলে সন্তানের অনিষ্ট হইতে পারে। অনেক প্রসূতিই সন্তানকে যখন তখন স্তন্য পান করান। সন্তান যে কোন কারণে কাঁদিলেই তাহার মুখে স্তন দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করেন।

স্তন দুগ্ধেই শিশুর পুষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। **স্তনদুগ্ধ পান কালেও প্রসূতির কতকগুলি নিয়ম পালন করা আবশ্যক।**

(১) **পরিচ্ছন্নতা**—স্তন দুগ্ধের সহিত শিশুর পাকস্থলীতে ধূলা প্রভৃতি যাইতে পারে ও ইহাতে নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। শিশুকে খাওয়াইবার পূর্ব্বে ও পরে স্তনের বোঁটা উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলা উচিত। স্তনের বোঁটায় দুধ লাগিয়া থাকিলে তাহাতে বীজাণু জন্মিয়া শিশুর বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে। বাহিরে পরিষ্কার থাকিলেও বোঁটার মুখে কিছু দূষিত দুগ্ধ থাকিতে পারে। সেইজন্য শিশুকে স্তনদান করিবার পূর্ব্বে কিছু দুগ্ধ গালিয়া বাহির করিয়া ফেলা উচিত।

(২) **স্তনদানের নিয়মিত সময়**—প্রথম হইতেই শিশুকে স্তন দিবার নির্দ্ধারিত সময় থাকা উচিত। শরীরের প্রত্যেক যন্ত্রেরই কার্য্যের পর বিশ্রাম আবশ্যক। যদি আহারের সময়ের মধ্যে

যথেষ্ট ব্যবধান রাখিয়া স্তন দেওয়া যায়, তাহা হইলে পরিপাক ক্রিয়া সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে। প্রতি বৎসর বহু স্তন্যপায়ী শিশু অনিয়মের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অনেকে পরিপাক সম্বন্ধীয় রোগে কষ্ট পায়।

শিশু যখনই ক্রন্দন করে, মাতা যদি তখনই তাহাকে স্তন দান করেন, তাহা হইলে শিশুর একটী বদ অভ্যাস হইয়া যায় এবং সেটী সহজে ছাড়ান যায় না। ভাল জিনিষ শীঘ্র অভ্যাস করান যায়; কিন্তু মন্দ অভ্যাস শীঘ্র ছাড়ান যায় না। স্তন্যপানের মধ্যে ব্যবধান অল্প থাকিলে দুগ্ধে আমিষ জাতীয় দ্রব্যের আধিক্য হয় এবং ইহাতে শিশুর পেটের পীড়া উপস্থিত হইতে পারে।

স্তনদুগ্ধ শিশুর পাকস্থলীতে এক ঘণ্টা কাল থাকে। অর্দ্ধ ঘণ্টা পাকস্থলীকে বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে দুইবার স্তনদানের মধ্যে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল ব্যবধান থাকা কর্ত্তব্য।

শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহারের মাত্রা বাড়িয়া যায়। তখন অধিক সময়ের ব্যবধান দেওয়া আবশ্যক।

(৩) **দুগ্ধের মাত্রা ঠিক রাখিতে হইবে**—অপর দুগ্ধের বেলা মাপিয়া শিশুকে পান করিতে দেওয়া হয়। স্তনদুগ্ধের বেলা শিশু নিজেই মাত্রা ঠিক করে। সাধারণতঃ মাত্রা পূর্ণ হইলে শিশু স্তন ছাড়িয়া দেয় এবং অত্যধিক হইলে তুলিয়া ফেলে। কিন্তু এ বিষয়ের নিশ্চয়তা নাই।

যদি মনে হয় যে উপরি-উক্ত পরিমাণে শিশুর যথোচিত পুষ্টি হইতেছে না, তাহা হইলে আবশ্যকানুযায়ী মাত্রা বাড়াইতে হইবে। ১ ছটাক পরিমিত দুগ্ধ টানিয়া লইতে ভিন্ন ভিন্ন শিশুর সময়ের অনেক তারতম্য দেখা যায়। শিশু বয়োবৃদ্ধির সহিত দুগ্ধ টানিয়া খাইতে পারগ হইলেও, মাতার স্তনের অবস্থার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। মাতার ও সন্তানের পরস্পরের সাহায্যে এই স্তনপান ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

মাতৃস্তন হইতে দুগ্ধ নিঃসারণ যদি কমাইবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা বোঁটার গোড়া চাপিয়া ধরিলেই কমান যাইতে পারে। যদি দুগ্ধ নিঃসারণ মৃদু হয় তাহা হইলে অগ্রে স্তন মর্দ্দন করিয়া পরে সন্তানের দুগ্ধ পানের সময় চাপ দিলে বেশী দুগ্ধ নির্গত হয।

শিশুর শরীরের আবশ্যকমত স্তনদুগ্ধ যোগাইতে হইলে নিম্ন লিখিত উপায় সকল আবশ্যক হয়।

(১) যদি স্তনদুগ্ধ পরিমাণে বেশী হয় তাহা হইলে স্তন পানের সময় মাতা স্তনের বোঁটা টিপিয়া আবশ্যকমত দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

(২) যদি মাতার দুগ্ধের দোষ থাকে তাহা হইলে মাতার চিকিৎসা দ্বারা তাহার দুগ্ধ দোষহীন করিতে হইবে।

স্তন্য দানের নিয়ম।

প্রসবের পর দিন শিশুটিকে ছয় ঘণ্টা অন্তর স্তন্য দান করিবে। তাহার পরদিন ৫ ঘণ্টা অন্তর দিতে হইবে। এইরূপে শিশুকে স্তন্য পানে অভ্যাস করাইতে হইবে এবং মাতাকেও স্তন দিবার অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপে স্তন হইতে (colostrum) গাজালে দুগ্ধ বাহির হইবে এবং মাতার জরায়ুও সঙ্কুচিত হইবে।

শিশু আপনা হইতেই কি পরিমাণ স্তন দুগ্ধ পান করিবে তাহা বলা অসম্ভব। শিশু খুব অল্প কি খুব অধিক পরিমাণেও খাইতে পারে।

অনেক গ্রন্থকার ও বৈজ্ঞানিক কত বয়সের শিশু কতটুকু স্তন দুগ্ধ টানিয়া লইবে তাহার মোটামুটি একটা পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। তাঁহারা শিশুকে স্তন পান করাইয়া পূর্ব্বে ও পরে ওজন করিয়া এই গড়পড়তা পরিমাণ স্থির করিয়াছেন।

স্তন্যদানের নিয়ম।

শিশুর বয়স	প্রাতে ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত কতক্ষণ অন্তর খাওয়াইতে হইবে।	রাত্রি ৯টা হইতে প্রাতে ৭টা পর্য্যন্ত কতবার খাওয়াইতে হইবে।	২৪ ঘণ্টায় কতবার খাওয়াইতে হইবে।	প্রত্যেক বারের পরিমাণ
১ দিন	৬ ঘণ্টা	১	৪	$\frac{১}{৪}$—$\frac{১}{২}$ আউন্স
২ দিন	৪ ,,	১	৬	$\frac{১}{২}$—$\frac{৩}{৪}$,,
৩ দিন হইতে ১ মাস ...	২ ,,	২	১০	$\frac{৩}{৪}$—১$\frac{১}{২}$,,
২ মাস হইতে ৩ মাস ...	২॥ ,,	১	৮	২—৩$\frac{১}{২}$,,
৪ মাস হইতে ৬ মাস ...	৩ ,,	১	৭	৪$\frac{১}{২}$—৬ ,,
৭ মাস হইতে ১ বৎসর ...	৪ ,,	০	৫	৭—৯ ,,

শিশুর স্তন পানের পূর্ব্বে ও পরে ওজন করিলে পরিমাণের ওজন পাওয়া যাইবে।

স্তনে যখন দুগ্ধের হ্রাস হয়, তখন সাধারণতঃ প্রসূতিকে অধিক মাত্রায় পানাহারের ব্যবস্থা দেওয়া হয় এবং শারীরিক পরিশ্রম করিতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু প্রসূতির আহারের পরিপাক যদি স্বাভাবিক থাকে তাহা হইলে অধিক খাদ্য পরিপাক করিতে না পারায় এই ব্যবস্থা উপকার জনক না হইয়া বরং অনিষ্টকরই হয়; অর্থাৎ ইহাতে দুগ্ধ বৃদ্ধি না হইয়া বিষাক্ত দুগ্ধের সৃষ্টি হয়।

মাতৃস্তনে দুগ্ধ বৃদ্ধির উপায়।

দুগ্ধবৃদ্ধি নিম্নলিখিত দুইটী অবস্থার উপর নির্ভর করে।

১। শরীরের স্বাভাবিক পরিপুষ্টি সাধন।

স্তনের পরিপুষ্টি প্রসূতির সমগ্র শরীরের পুষ্টির উপর নির্ভর করে। এই শরীরের পরিপুষ্টি কখনও অপরিমিত আহার দ্বারা সাধিত হয় না। সুতরাং দুগ্ধের পরিমাণ কম হইলে কখনও স্তনদাত্রীকে অধিক আহারের ব্যবস্থা দেওয়া উচিত নয়। তাহার পক্ষে সম্যক্ ব্যবস্থা করিতে হইলে তাহাকে উপযুক্ত পরিমাণে লঘু বলকর আহার্য্য নিয়মিত সময়ে খাইতে এবং মুক্ত বায়ুতে অঙ্গ-চালনা জন্য ভ্রমণ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

২। স্বাভাবিক উপায়ে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি করণ।

বিবিধ উপায়ে স্তনের দুগ্ধ ক্ষরণ শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। প্রথমতঃ সমস্ত শরীরের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিলে স্নায়ু মণ্ডলী সতেজ হইয়া পরোক্ষে স্তনকেও সতেজ করিবে। আর মনে রাখিতে হইবে যে জননীর মানসিক অবস্থার বিপর্য্যয়ে দুধের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। অতি মাত্রায় মানসিক উত্তেজনা কিংবা মানসিক চাঞ্চল্য বশতঃ দুগ্ধ বিষাক্ত হইতে পারে। নৈরাশ্যে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলে দুগ্ধক্ষরণ একেবারে বন্ধ হইয়া যাওয়া আশ্চর্য্য নহে। মনে স্ফূর্ত্তি থাকিলে শুধু যে প্রসূতির দুগ্ধ অধিকতর বলকারক হয় তাহা নহে, তাহার পরিমাণও বৃদ্ধি হয়।

সুতরাং প্রসূতির স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে যাহাতে তাহার শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি বজায় থাকে তাহা দেখিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ শিশু নিজেও যদি মাতার স্তন হইতে যথেষ্ট দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে তাহা হইলেও স্বভাবতঃ দুগ্ধ বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু শিশু যদি দুর্ব্বল হয়, তবে তাহার দুগ্ধ আকর্ষণের ক্ষমতাও কম থাকে এবং মাতার দুগ্ধ বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপ ক্ষেত্রে যদি কোন বলিষ্ঠ শিশুকে প্রসূতির স্তনপান করিতে দেওয়া হয়, তবে যথা নিয়মে আকর্ষণ করার জন্য দুগ্ধের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে পারে।

সাধারণতঃ দরিদ্র ঘরের প্রসূতিদের দুগ্ধের অভাব দেখা যায় না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে জননী জানে যে তাহার সন্তানকে স্তন্য দানে প্রতিপালন করিতে হইবে, ইহা ভিন্ন তাহার সন্তান প্রতিপালনের আর অন্য উপায় নাই। তাহাদের হৃদয়ের এই আবেগই দুগ্ধ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ। ঔষধের মধ্যে Cod Liver oil, Cotton Seed oil ইত্যাদি এবং খাদ্যের মধ্যে মাষকলাই কালজিরা, কৃষ্ণতিল ইত্যাদি দুগ্ধ বৃদ্ধির সহায়ক ; কিন্তু মুসুরি, লঙ্কা ইত্যাদি দুগ্ধের পরিমাণ কমাইয়া দেয়।

শিশুর খাদ্যের পরিমাণ অধিক কি কম হইতেছে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে। **আহারের মাত্রা কম হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা যাইবে।**

১। শিশুর ওজনের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না।

২। স্তনপান কালে অস্থিরতা এবং স্তনপানের পর তৃপ্তির অভাব।

৩। শিশু দুধ তোলে না।

৪। শিশু পুনঃ পুনঃ অল্পমাত্রায় মলত্যাগ করে ;

৫। প্রস্রাবের পরিমাণ কম হয়।

৬। সুনিদ্রা হয় না।

শিশুর খাদ্যের পরিমাণ অধিক হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা যায়।

১। আহারের অব্যবহিত বা কিয়ৎ কাল পরে শিশু বমন করে।

২। পেটফাঁপা, পেটকামড়ানি বা অজীর্ণতার অন্যান্য লক্ষণ দেখা যায়।

৩। স্তন্য পান করিয়া শিশু পরিতৃপ্ত হয়।

৪। শিশুর ওজন অতি শীঘ্র বৃদ্ধি পায়।

৫। শিশু অনেক বার অধিক পরিমাণে মলত্যাগ করে।

৬। শিশুর প্রস্রাবের মাত্রা বেশী হয়।

৭। শিশুর মস্তকে ও ঘাড়ে অধিক ঘাম হয়।

৮। অতিরিক্ত নিদ্রা ও আলস্যের লক্ষণ দেখা যায়।

শিশুর স্তন্যত্যাগ

শিশুকে ক্রমে ক্রমে স্তন্য পরিত্যাগ করান উচিত। গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালেই স্তন্য পরিত্যাগ করান ভাল। গ্রীষ্মকালে খাদ্য পরিবর্ত্তনের জন্য অনেক সময় শিশুর পেটের অসুখ হইতে দেখা যায়। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মতে শিশুর নয় মাস বয়সের পরই স্তন্য পরিত্যাগ করান উচিত। আমাদের দেশের শিশুকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত স্তন্যদান করা হইয়া থাকে। ইহাতে জননীর কখন কখন স্বাস্থ্যহানি হয়। শিশু যদি দশ মাসের পরও কেবল মাত্র স্তন দুগ্ধের উপর নির্ভর করে তাহা হইলে Rickets রোগ প্রকাশ পায়। তবে স্তন দুগ্ধের সহিত কৃত্রিম আহার মিশ্রিত ভাবে চলিলে কোন ক্ষতি হয় না।

হঠাৎ স্তনত্যাগ।

মাতার হঠাৎ কোন দীর্ঘকাল স্থায়ী কঠিন পীড়া যথা টাইফয়েড জ্বর, নিউমোনিয়া, ক্ষয়রোগ, মূত্রগ্রন্থির পীড়া বা স্তনের পীড়া ইত্যাদি হইলে বাধ্য হইয়া শিশুকে স্তনত্যাগ করাইতে হয়।

যদি পীড়া অল্পকাল স্থায়ী হয় তাহা হইলে শিশুকে মাতার অসুখের কয়দিন কেবল কৃত্রিম আহার দিয়া পালন করিবে। Breast Pump দ্বারা মাতৃ স্তনের দুগ্ধের ক্ষরণ বজায় রাখিবে। পরে রোগ আরোগ্য হইলে শিশুকে পুনরায় স্তন্য দানের ব্যবস্থা করিবে।

ধাত্রী নিয়োগ।

শিশু মাতৃদুগ্ধ না পাইলে স্তন্যদান করিতে পারে এরূপ কোন ধাত্রী নিয়োগ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। বিশেষরূপ পরীক্ষা ব্যতীত কখনও ধাত্রী নিযুক্ত করা উচিত নহে। কারণ ধাত্রীর কোন প্রকার ব্যাধি থাকিলে শিশুতে তাহা সংক্রামিত হইতে পারে। ধাত্রীর বয়স ১৮ হইতে ৩০এর মধ্যে হওয়া উচিত এবং তাহার নিজের সন্তানের বয়স পালিত শিশুর বয়সের অনুরূপ হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়।

মিশ্র আহার।

শিশুর আহারের পক্ষে মাতৃদুগ্ধের পরিমাণ যথেষ্ট না হইলে কিম্বা মাতার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইলে মাতৃদুগ্ধ ব্যতীত কৃত্রিম খাদ্যের ব্যবস্থা করা উচিত। মাতৃ স্তন্যের পরিমাণ নিতান্ত সামান্য হইলেও শিশুকে তাহা হইতে একেবারে বঞ্চিত করা উচিত নহে। অনেক স্থলেই নানা কারণে কেবল মাত্র স্তনদুগ্ধে শিশু পালন সম্ভবপর হয় না। শিশুর আহারের জন্য স্তনদুগ্ধ ও কৃত্রিম খাদ্য উভয়ের ব্যবস্থা করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক।

সপ্তম অধ্যায়।

শিশুর ক্রমবিকাশ।

শিশুপালন যে কি দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য তাহা আমরা প্রায়ই চিন্তা করি না। সদ্যোজাত শিশু ও বয়স্ক যুবক বা বালকের শরীরের মধ্যে বহুপরিমাণে পার্থক্য বিদ্যমান ; শিশু পালন-বিধি আমাদের জীবন-যাপনের নিয়ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও নবপ্রণালী অনুসারে গঠিত। সন্তানচর্য্যা প্রকৃত পক্ষে যে সন্তানের সেবা, এই কথা আমরা সন্তান-পালনের সময়ে হৃদয়ে অনুভব করি না।

আমরা এই প্রবন্ধে শিশুপালনের সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিষয় ও কতিপয় নিয়মাবলীর আলোচনা করিব।

ভূমিষ্ঠ হইয়া মানবশিশু অতি পরাধীনরূপে জীবন ধারণ করে ; জীব-জগতে অপর কোন প্রাণীর সন্তান জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক এত পরাধীন অবস্থায় থাকে না। মার্জ্জার-শাবক অন্ধ হইয়া জন্মায় বটে, কিন্তু জন্মগ্রহণের কিয়ৎকাল পরেই হামাগুড়ি দিবার শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং কতিপয় দিবস মধ্যে দর্শনশক্তি লাভ করে ও ক্রীড়া করিতে সক্ষম হয়। মেষ-শাবক জন্মগ্রহণের কিয়ৎকাল মধ্যেই ক্ষেত্রে উল্লম্ফন করিতে আরম্ভ করে।

কিন্তু মানব-সন্তান জন্মগ্রহণের পর বহুকালাবধি নিতান্ত পরাধীন অবস্থায় থাকে। তাহার গমনাগমনশক্তি জন্মগ্রহণের বহু মাস পরে হয় ও দর্শনেন্দ্রিয় কয়েক সপ্তাহ পরে স্ফূর্ত্তি লাভ করে। সে বাক্‌শক্তিরহিত, গমনাগমন শক্তিহীন এবং অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় স্বীয় অঙ্গ পরিচালনায় একেবারে অক্ষম। তখন কেবলমাত্র ক্রন্দনই তাহার সম্বল।

বিশ্ববিধাতা নব অতিথিটী যখন আমাদের ঘরে পাঠান, তখন তাহার সকল ভার আমাদের উপর ন্যস্ত করেন। এই ঈশ্বরদত্ত দায়িত্বপূর্ণ মমত্ব-বোধ মনে সদা জাগরুক রাখা (সন্তানপালনের সময়) আমাদের কর্ত্তব্য। প্রতি বৎসর শত শত অপোগণ্ড শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ও কত শত বিকলাঙ্গ বা অসুস্থ দেহে বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার একমাত্র কারণ, সন্তান-পালক বা পালিকার অযত্ন ও অজ্ঞতা।

শিশুর শরীরের গঠন—শিশু ও বয়স্ক মনুষ্যের মধ্যে অস্থি গঠন সম্বন্ধেও অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শিশুর দেহ উপাস্থিময় ও নমনীয়। বৃদ্ধ বৃক্ষ-শাখা ও ক্ষুদ্র বৃক্ষ-শাখার মধ্যে যেরূপ পার্থক্য, বয়স্কের ও শিশুর অস্থি মধ্যে সেইরূপ প্রভেদ। আমরা বর্ষীয়ান ব্যক্তির অস্থি ভাঙ্গিতে পারি, কিন্তু নত করিতে পারি না; আবার শিশুর অস্থি সহজে ভাঙ্গা যায় না বটে, কিন্তু নত করা যায়। আর, একবার নত হইলে, তাহাকে পুনরায় উন্নমিত ও স্বাভাবিক করা কখনও আয়াসসাধ্য এবং কখনও অসম্ভব হয়।

শিশুর এই অস্থি গঠনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহার দেহ সদা সর্ব্বদা এরূপ ভাবে স্থাপন করিতে হইবে, যেন শরীরের কোন অঙ্গের অস্থি অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হয়। যেন কোন অস্থি হেলিয়া বা বেকিয়া না পড়ে। শিশুর পদদ্বয় তাহার শরীরের ভার বহনের উপযুক্ত শক্তি লাভ করিবার পূর্ব্বেই, এইরূপ শিশুকে লইয়া ক্রীড়া করা বিপদ্-জনক। শিশু যথাসময়ে আপন স্বভাবে বর্দ্ধিত হইয়া প্রকৃত নিয়ম অনুসারে যখন আপন সামর্থ্যে আপনিই দণ্ডায়মান হইবে তখনই মঙ্গল।

অতি অল্প বয়স্ক শিশুকে বসাইলে গুরুতর অমঙ্গলের সম্ভাবনা। শিশুর মেরুদণ্ড যখন যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করে নাই, পৃষ্ঠদেশের মাংসপেশী যখন শক্তি প্রাপ্ত হয় নাই, সেই সময়ে তাহাকে ভূমি উপরি বসাইলে যে ক্ষতি

হইবে তাহা অতি সত্য,—তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই সহজে বুঝিতে পারেন। মেরুদণ্ডের নিম্নস্থিত অস্থিচালনাও কল্যাণজনক নহে। ত্রিকাস্থি ও অনুত্রিকাস্থি (sacrum ও coccyx) নামে যে দুই অস্থি আছে, তাহারা তৎকালে খণ্ড খণ্ড ও পৃথকরূপে বর্ত্তমান থাকে। কালক্রমে সেই অবিভক্ত অস্থিসমূহ সংলগ্ন হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও দুই অস্থিতে পরিণত হয়। অতি শৈশবকালে, সেই গঠনের পূর্ণতা লাভের পূর্ব্বে সন্তানের দেহের উপর অত্যাচার করিলে, তাহার ভাবী ফল যে ভয়াবহ হইয়া উঠে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিশুর দেহের যতদিন না একটা বাধুনী হয়, এবং অস্থিস্তর ও মাংসপেশী শক্তিসম্পন্ন না হয়, ততদিন তাহাকে প্রকৃতি-ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া উচিত। তাহাকে লইয়া কোন প্রকার বিপজ্জনক ক্রীড়া করা, উপবিষ্ট করান বা ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া আমোদ করা কখনও যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহাতে শিশুর বিশেষ অমঙ্গল হইয়া থাকে, ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক। ভূমিষ্ঠ হইবার পর কয়েক মাস পর্য্যন্ত তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে শোয়াইয়া রাখিতে হইবে। যতদিন না সে স্বীয় চেষ্টায় উঠিয়া বসিতে পারে বা দাঁড়াইতে পারে ততদিন তাহাকে বসান বা দাঁড় করান অনুচিত। তাহাকে স্থানান্তর করিবার সময়ে বিশেষ সাবধানে লইতে হইবে।

শিশুর শরীরের বৃদ্ধি।

শিশুর ওজন—ভূমিষ্ঠ হইবার কালে সাধারণতঃ শিশু তিন হইতে সাড়ে তিন সের ভারি হয়। পরে তিন চারি দিনের মধ্যেই প্রায় অর্দ্ধ সের ওজন কমিয়া যায়। পুনরায় সাত দিনের মধ্যে সেই অর্দ্ধ সের বৃদ্ধি পায়; অর্থাৎ ১০ দিনের মধ্যে শিশুর ওজন ভূমিষ্ঠ হইবার ওজনের সহিত সমান হইয়া থাকে। এই সময় হইতে শিশু ক্রমশঃ ওজনে বাড়িতে থাকে।

যদি শিশুর ওজন ক্রমশঃই কমিয়া যায় বা বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলে

পুষ্টির অভাব বা রোগ জন্মিয়াছে বুঝিতে হইবে। ৫ পাঁচ মাস বয়সে শিশুর ওজন দ্বিগুণ হয়; এক বৎসর বয়সে শিশুর ওজন ভূমিষ্ঠ হইবার কালের ওজনের তিনগুণ হইয়া থাকে। স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম ছয় মাস কাল প্রত্যেক সপ্তাহে অর্দ্ধ পোয়া (৪ আউন্স) করিয়া ওজন বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় বৎসরে ৩ সের (৬ পাউণ্ড), তৃতীয় বৎসরে দুই সের একপোয়া (৪।৷০ পাউণ্ড) বৃদ্ধি হয়। চতুর্থ হইতে অষ্টম বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসর দুই সের করিয়া ওজন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নবম, দশম ও একাদশ বৎসরে তিন সের করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

শরীরের দীর্ঘতা—ভূমিষ্ঠ হইবার কালে শিশুর শরীরের দীর্ঘতা ১৯ হইতে ২০ ইঞ্চি হইয়া থাকে। ছয় মাস বয়সে ২৪ ইঞ্চি ও প্রথম বৎসরে আট ইঞ্চি লম্বে বর্দ্ধিত হয়। দ্বিতীয় বৎসর ১।৷০ ইঞ্চি এবং তৎপরে ১১ বৎসর পর্য্যন্ত দুই হইতে তিন ইঞ্চি করিয়া প্রতি বৎসর বাড়িয়া থাকে।

শরীরের ওজন ও দীর্ঘতা শিশুর সুস্থ অবস্থায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পুষ্টির অভাব বা রোগ জন্য ইহাদের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে।

শিশুর মস্তক ও মস্তিষ্ক—কে মানব, কে পশু, —তাহা বুদ্ধি ও চিন্তাদেবী নিরূপণ করিয়া দেন; তাঁহারা যাঁহার উপর সদয়া হন, তিনিই প্রকৃত মানব। আমাদের এই বুদ্ধি ও চিন্তার আকর মস্তিষ্ক। যাঁহাদের মস্তিষ্কে কোন দোষ উৎপন্ন হয়, তাঁহাদের সমস্ত জীবন অমঙ্গল-ময়। যাঁহাদের মস্তক প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ও মস্তিষ্ক কোন প্রকার বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, তাঁহারা অত্যন্ত সুখী, বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল।

মানব-শিশুর শিরোদেশ ও মস্তিষ্কের প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা

কর্ত্তব্য। মস্তক যথোপযুক্তরূপে ব্যবহৃত না হইলে অতি শীঘ্র শিশুর ভাবী জীবন দুঃখময় হয়।

আমাদের মস্তক, অস্থি-পত্র ও তদুপরিভাগ চর্ম্ম দ্বারা আবৃত। মস্তকের মধ্যভাগের নিম্নদেশে মস্তিষ্কের স্থান। সদ্যোজাত শিশুর মস্তিষ্কোপরি কিন্তু কোন অস্থিপত্র থাকে না, কেবল তাহা চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বভাববিধি অনুসারে অস্থি-পত্রাচ্ছন্ন হয়। এজন্য শিশুর মস্তিষ্ক অতি সাবধানে রক্ষা করিতে হইবে। প্রকৃতি যখন আপন কার্য্য করিয়া যায় তখন তাহার কর্ম্মে কোনরূপ বাধা প্রদান করিলে মহা অনিষ্ট ঘটিতে পারে। চর্ম্মাচ্ছাদিত মস্তিষ্ক অতি কোমল, অনেকে তাহা জানিয়াও সর্ব্বদা হস্তদ্বারা মর্দ্দন করেন, ইহা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। কখন কখন এইরূপ করিতে করিতে মস্তিষ্কে আঘাত লাগিয়া শিশুর ফিট হইতে দেখা গিয়াছে, এবং রক্তের শিরা ছিন্ন হইলে মৃত্যুর আশঙ্কাও আছে।

শিশুর মস্তকের বেড় ভূমিষ্ঠ হইবার কালে ১৩ হইতে ১৪ ইঞ্চি হইয়া থাকে। প্রথম বৎসরে এই বেড় প্রায় ৪ ইঞ্চি বাড়িয়া থাকে, দ্বিতীয় বৎসর ১ ইঞ্চি এবং পাঁচ বৎসর বয়সে আরও ১॥০ ইঞ্চি বাড়িয়া থাকে। মস্তিষ্কের অস্থিপত্রের যোড়গুলি বন্ধ হইতে ছয় হইতে নয় মাস সময় লাগে। পশ্চাতের ত্রিকোণ সন্ধিস্থানটি (Posterior fontanelle) দুই মাসের মধ্যেই বন্ধ হইয়া থাকে; সম্মুখের চতুষ্কোণ সন্ধিস্থানটি (Anterior fontanelle) প্রায় ১৮ মাস পর্য্যন্ত অল্প পরিমাণে অসংলগ্ন থাকে। যদি শীঘ্র বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে মস্তিষ্কের বৃদ্ধির মাত্রাও কম হইয়া যায়। রিকেটস্ রোগে এই সকল সন্ধি স্থান অনেক দিন যাবৎ অসংলগ্ন থাকে এবং তিন বৎসর পর্য্যন্তও অসংলগ্ন অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। Cretinism রোগে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত অসংলগ্ন থাকিতে দেখা যায়।

আমাদের চরিত্র আমাদের অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। আমরা যেরূপভাবে অভ্যাস করি, আমাদের জীবনও সেইভাবে গঠিত হইয়া উঠে। এই অভ্যাস শিশুকাল হইতেই আরম্ভ হয়। শিশু জগতের কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না, কিন্তু তাহার ধরাতলে আগমনের পর মুহূর্ত্ত হইতেই এই জ্ঞান প্রাপ্তির অভ্যাস দ্বারা তাহার জীবন গঠনের কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথমে সে কিছু বুঝিতে পারে না, এক বস্তু হইতে অন্য জিনিষ পৃথক করিতে পারে না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে চতুর্দ্দিকে যাহা দর্শন করে, শ্রবণ করে ও তাহার পারিপার্শ্বিকের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, তাহা দ্বারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আপন প্রকৃতি গঠন করিতে অভ্যাস করে। শিশু জীবনের প্রত্যেক দৃষ্ট বস্তু, শ্রুত বাক্য ও স্বজনদিগের ব্যবহার শিশুর জীবন গঠনের উপর কোন না কোন কার্য্য করিয়া থাকে। শিশু মস্তিষ্কে অতি শীঘ্র রেখাপাত হয়। সুতরাং শিশুর পালক বা পালিকাকে এই বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হইতে হইবে। কুম্ভকার হস্ত দ্বারা যেরূপ কর্দ্দম হইতে ইচ্ছানুরূপ পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, শিশুর পালক ও পালিকারাও ইচ্ছা করিলে সেইরূপ আপন ব্যবহার দ্বারা শিশুর ভাবী জীবন গঠন করিতে পারেন।

শিশুর অভ্যাস ও চরিত্র গঠন।

এইরূপে শিশুর ভবিষ্য জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। শিশুর সম্মুখে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া কার্য্য করা উচিত, তাহার হিতার্থী অভিভাবকের ব্যবহার যেন সর্ব্বদা তাহাকে সদাচারে অভ্যস্ত করে। শিশুর মস্তিষ্কে যেন কোন প্রকার মন্দ ক্রিয়ার রেখাপাত না হয়। অনেকে দাস-দাসীগণের উপর শিশুর পরিচর্য্যার ভার অর্পণ করেন। কিন্তু ইহাতে অনিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অশিক্ষিত অল্পমতি দাস-দাসীগণের নিকট হইতে শিশুসকল নানারূপ কুশিক্ষা লাভ করে

এবং সমস্ত জীবন তাহার ফলভোগ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু শিশুজননী-গণ যদি যথার্থ মাতৃস্নেহে শিশুপালন পূর্ব্বক তাহাকে সংশিক্ষা দান করেন, ও তাহার স্বাস্থ্যরক্ষণে সহায়তা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কালে সুসন্তানের জননী বলিয়া ধন্যা হইতে পারেন। সচ্চরিত্র্য, বিদ্বান ও কর্ম্মী পুত্রধনে গর্ব্বিতা এক ইংরাজ মাতার কথা শুনিয়াছি। তাহা এই—তিনি বলেন "শিশুকাল হইতে আমি সন্তানদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলাম। আপনার প্রার্থনার সময়ে তাহাদিগকে লইয়া বসিতাম এবং সদা সর্ব্বদা তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতাম, যেন কোন অসৎ সঙ্গে পতিত না হয়। কুসঙ্গ হইতে তাহাদিগকে সর্ব্বদা দূরে রাখিতাম এবং তাহারা যাহাতে কোনরূপ কুকার্য্য দর্শন বা কুকথা শ্রবণ বা কোন কু-অভ্যাসে রত না হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া থাকিতাম।" বস্তুতঃ শিশুকে সুস্থ ও চরিত্রবান করিতে হইলে মাতা-পিতাকেও সাধুস্বভাব হইতে হয়,—তাঁহাদের কার্য্যকলাপ অতি বিশুদ্ধ হওয়া উচিত।

শিশুকে কেবল বই পড়াইয়া সম্যক্ শিক্ষাদান করা যায় না; তাহার সম্মুখে সর্ব্বদা স্বভাবতঃ যাহা ঘটিবে সে তাহাই শিখিবে।

সাধুস্বভাব অভিভাবকের অধীনে শিক্ষিত শিশু, নিশ্চয় বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরপরায়ণ, সচ্চরিত্র, সত্যবাদী ও পরিশ্রমী হইয়া থাকে।

প্রত্যেক শিশুর জনক ও জননী যদি শিশুপালনব্রত গ্রহণপূর্ব্বক আপনাদের স্বাস্থ্য, সচ্চরিত্রতা ও সদ্ব্যবহার দ্বারা শিশুকে স্বাস্থ্যবান্ করেন ও সৎ আচরণ শিক্ষা দেন, তাহা হইলে তাঁহারা আপনাদের কর্ত্তব্য যথার্থরূপে সম্পাদনপূর্ব্বক শিশুর ভাবী জীবন মঙ্গলময় করিয়া তদ্দ্বারা জাতীয় জীবনকেও যথেষ্ট গৌরবান্বিত করিতে পারেন। তাহা না করিলে সদা অসুস্থ অসচ্চরিত্র ও নিন্দিত সন্তান দর্শনে

আপনাদের জীবন ও শিশুদের জীবন নিয়ত দুঃখময় হয়; তাহাতে সমাজ যারপর নাই সর্ব্ববিধ দুঃখের আকর হইয়া উঠে।

শিশুর অঙ্গ সঞ্চালন ও ইন্দ্রিয় সকলের স্ফুরণ।

চতুর্থ মাসেই শিশু অঙ্গচালনা করিতে সক্ষম হয়। কোন দ্রব্য পাইলেই ধরিতে চেষ্টা করে। মস্তক সোজা ভাবে রাখিতে সক্ষম হয়। সাতমাস পরে শিশু বসিতে পারে; নয় মাসে দাঁড়াইতে পারে। এক বৎসর বয়স হইলেই চলিতে চেষ্টা করে। ১৫ মাস হইতে ১৮ মাসের মধ্যে নিজে নিজে চলিতে সক্ষম হয়।

নবজাত শিশুর চক্ষুতে আলোক সহ্য হয় না। চক্ষুর কণিকা আলোকে সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং চক্ষুর পাতা বন্ধ হইয়া থাকে। তিনমাসের পর চক্ষুর বাহিরের মাংসপেশী সকল কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। চক্ষুর সম্মুখের কাচের ন্যায় স্বচ্ছ আবরণের (Cornea) স্পর্শশক্তি অতি সামান্য মাত্রায় থাকার জন্য শিশুর চক্ষু অতি সাবধানতার সহিত ধৌত করা আবশ্যক এবং যাহাতে কোন বহিস্থ দ্রব্য চক্ষুতে না পড়ে সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবে। প্রথম সপ্তাহে চক্ষুর নিকট কোন জিনিষ আনিলেও চক্ষুর পাতা বন্ধ হয় না। ছয় মাস পর্য্যন্ত শিশু কোন দ্রব্য স্পষ্টরূপে চিনিতে সক্ষম হয় না। চক্ষুর জল ২।৩ মাস পর্য্যন্ত দেখা যায় না। ভূমিষ্ঠ হইবার ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে শ্রবণ শক্তি বিকাশ পায় না। কখন কয়েক দিন পরে ইহার বিকাশ হইয়া থাকে। প্রথম কয়েক মাস পর্য্যন্ত ইহা অতি তীক্ষ্ণ ভাবে থাকে। শিশু কোন শব্দ পাইলে চমকিয়া উঠে। হঠাৎ কোন বড় শব্দে শিশুর তড়কা পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। দুই তিন মাস বয়স হইলেই শিশু শব্দের দিকে ফিরিতে আরম্ভ করে। আর একমাস বাদে গলার স্বর চিনিতে পারে বলিয়া বোধ হয়।

স্পর্শ-শক্তি ভূমিষ্ঠ হইবার কালে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু ইহা ঠোঁটে এবং জিহ্বাতেই তীক্ষ্ণ ভাবে উপস্থিত থাকে। তৃতীয় মাসে ইহা সাধারণভাবে সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়। মুখগহ্বর কিন্তু সামান্য তাপের তারতম্য বিশেষ অনুভব করে; সেইজন্য শিশুদিগকে আহার্য্য দিবার কালে খাদ্য দ্রব্যাদির তাপ ঠিক করিয়া দিতে হইবে।

বাকশক্তি ও দন্ত—প্রথম বৎসরের পর বাক্‌শক্তির বিকাশ আরম্ভ হয়। বালিকাদিগের বালক অপেক্ষা শীঘ্র হইয়া থাকে। ছয় মাসের সময় শিশুর দন্তোদ্গম আরম্ভ হয় এবং দুই বৎসরের মধ্যে দুগ্ধদাঁত সকল (২০টা) বাহির হয়। কোন কোন সুস্থ শিশুর দশ মাসে দাঁত বাহির হইতে আরম্ভ হয়। উপদংশ বিষের জন্য দন্ত শীঘ্রই বাহির হয় এবং অনেক উপদংশ বিষযুক্ত শিশু দন্তের সহিত ভূমিষ্ঠ হয়। রিকেটস্ ও ক্রিটিনিসম রোগে দন্ত বাহির হইতে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। শিশুর আহার্য্য হইতে উপযুক্ত পুষ্টি সাধন না হইলে দাঁত উঠিতে দেরী হয়।

লালা—প্রথম ছয় মাস যাবৎ শিশুর মুখ মধ্যে কেবল মুখগহ্বরকে আর্দ্র রাখিবার জন্য সামান্য লালা বর্ত্তমান থাকে। পরে দন্তোদ্গমের সহিত লালাস্রাব বেশী হয়। লালাস্রাব আরম্ভ হইবার পর শালি-জাতীয় (Starchy) খাদ্য শিশুকে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে।

ত্বক্—শিশুর চর্ম্মস্থিত ঘর্ম্মকারক কোষ সকল বর্দ্ধিত ও ক্রিয়াযুক্ত হইতে অনেক বিলম্ব হয়। সেই জন্য শিশু গরম সহ্য করিতে পারে না। এই জন্য সামান্য কারণে শিশুর তাপ বেশী বাড়িয়া উঠে।

শিশুর বিষ্ঠা—ভূমিষ্ঠ হইবার পর কয়েকদিন পর্য্যন্ত শিশুর বিষ্ঠা ঘন চট্‌চটে ও সবুজ আভাযুক্ত পাটকিলে বর্ণের হইয়া থাকে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ইহা হরিদ্রাভ বর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়। প্রথম দুই মাস কাল দাস্ত ৩।৪ বার হইয়া থাকে, বিশেষ কোন দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না। যদি মলের মধ্যে দুগ্ধ জমার টুক্‌রা দেখা যায়, তাহা হইলে শিশু

পরিপাকের অতিরিক্ত দুগ্ধ খাইতেছে ঠিক করিতে হইবে। ছয় মাস হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত গড়ে শিশুর দুইবার করিয়া দাস্ত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ মলে তীব্র গন্ধ পাওয়া যায়, রং ধূসর বর্ণ ধারণ করে। দুই বৎসরের পর মল বেশ কঠিন হয় এবং স্বাভাবিক মলের ন্যায় হইয়া থাকে।

শিশুর বিশ্রাম ও নিদ্রা।

শ্রান্তি অপনোদনের নিমিত্ত এবং দিবসের কর্ম্মক্লান্ত দেহে ও মনে নবশক্তি আর নবজীবন লাভ করিতে হইলে আমাদের রাত্রে সুসুপ্তিভোগ আবশ্যক। এই কর্ম্ম ও বিশ্রাম আমাদের জীবনে সমুদ্র তরঙ্গের উত্থান এবং পতনের ন্যায় বর্ত্তমান বলিয়াই আমাদের মঙ্গল ও স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। রাত্রিকালে ৬।৮ ঘণ্টা নিদ্রা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের প্রকৃতি বিরামদেবীর ক্রোড়ে এই কয়েক প্রহর আশ্রয় লাভ করিয়া সন্তুষ্ট। কিন্তু শিশু প্রকৃতির বিশ্রাম লাভের পিপাসা অনেক বেশী। এই জগতে যে নব জাগরণে জাগিয়া সংসার সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইবে, তজ্জন্য সে সুদীর্ঘ সুপ্তি প্রার্থনা করে। বস্তুতঃ জন্মগ্রহণের পর কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত শিশু অহর্নিশ নিদ্রিত থাকে। আহার কালে বা বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ কতিপয় ঘণ্টা যে জাগ্রত থাকিবে ইহা বলাই বাহুল্য।

ছয়মাস বয়সের শিশু রাত্রি ১০টা হইতে প্রভাতে ৭।৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত নিদ্রাসুখে নিমগ্ন থাকিবে। এতদ্ব্যতীত দিবাভাগে দীর্ঘকাল নিদ্রিত থাকিবে। অনেকে দীর্ঘনিদ্রা বাঞ্ছনীয় বোধ করেন না, ইহা তাঁহাদের বিষম প্রমাদ। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, রাত্রির পর দিবস আসে, নিবিড় অন্ধকার কাটিয়া উজ্জ্বল আলোক দেখা দেয় ও দীর্ঘ বিরামের পর নবশক্তি লাভ হয়।

শিশুর নিদ্রা সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

নিদ্রার যেন নিয়মিত কাল নির্দ্ধারিত থাকে এবং প্রতিদিন যেন নিরূপিত সময়ে শিশু নিদ্রিত হয়। এইরূপ নিয়মিত কালে অধিকক্ষণ নিদ্রা গেলে শিশুর স্বাস্থ্যের অত্যন্ত মঙ্গল হয়।

দিবাভাগে নিদ্রার সময়— প্রাতঃকালে ১½ ঘণ্টা ও দ্বিপ্রহরে কয়েক ঘণ্টা হওয়া বিধেয়। অপরাহ্নে শিশু জাগিয়া থাকিবে।

অনেকে শিশুকে ক্রোড়ে নাচাইয়া বা অন্য কোন উপায়ে আশু নিদ্রিত করিবার সহজ পন্থা উদ্ভাবন করেন। এইরূপ করা অনুচিত ও অমঙ্গলকর। কারণ শিশুকে যদি পূর্ব্ব হইতেই এই কু-অভ্যাস দান না করিয়া সহজভাবে নিদ্রিত হইবার অবসর প্রদান করা হয় তাহা হইলে বুদ্ধিমানের কার্য্য করা হয়। আবার অনেকে বলেন, শিশুকে কোলে লইয়া ঘুম না পাড়াইলে সে কিছুতেই ঘুমায় না কেবল কাঁদে। তাঁহারা ভাবেন না যে তাঁহারা প্রথমে শিশুকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইয়া তাহাকে এই অভ্যাসের বশবর্ত্তী করিয়া দিয়াছেন।

শিশুর শয়নাগার যেন আবর্জ্জনাহীন ও মুক্ত বায়ু পূর্ণ হয়। শিশুর পক্ষে স্বাস্থ্যকর বায়ুর অত্যন্ত প্রয়োজন। যে গৃহে বহু ব্যক্তি শয়ন করেন, সেরূপ কক্ষে তাহার নিদ্রার আয়োজন করা অনুচিত। শিশুর গৃহ অন্ধকারশূন্য ও স্বাস্থ্যকর বায়ুর আবাসস্থল হওয়া আবশ্যক।

শিশুর শয্যা তাহারই উপযুক্ত হইবে। শয্যা যেন সর্ব্বদা পরিষ্কার ও শুষ্ক থাকে। অপরিচ্ছন্ন বা আর্দ্র শয্যার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শিশুকে আপন ক্ষুদ্র শয্যায়, মাতৃশয্যার পার্শ্বে একাকী থাকিতে হইবে। মাতার সহিত একশয্যায় থাকিলে সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা। কারণ পরস্পর পরস্পরের নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে এবং নিদ্রাতুর মাতার অসাবধানতাবশতঃ অনেক শিশু মাতার শরীরের ভারে রুদ্ধশ্বাস হইয়া প্রাণ হারাইয়া থাকে।

আহারের পর শিশুকে দক্ষিণ পার্শ্বে শায়িত করিতে হইবে। খাদ্য-

পূর্ণ পাকস্থলী যেন কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত না হয়। অপর সময় বামপার্শ্বে শয়ন করানই যুক্তিযুক্ত, কারণ কেবল একপার্শ্বে শোয়াইলে দেহের অসমান বর্দ্ধন ঘটিতে পারে।

শয়নকালে শিশু যেন মুখব্যাদানপূর্ব্বক নিদ্রা না যায় এবিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইহা অতি কুঅভ্যাস ও স্বাস্থ্যক্ষয়কর। এ কারণ শিশুকাল হইতে এই অভ্যাস দূরীভূত করিয়া দিবার জন্য মাতৃবর্গ যেন বিশেষ সচেষ্ট থাকেন। মুখব্যাদানপূর্ব্বক শয়ন করিলে নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের কার্য্য প্রকৃতিদত্ত যন্ত্র নাসারন্ধ্র দ্বারা না হইয়া মুখগহ্বর দ্বারা সাধিত হয় বলিয়া ইহাতে শরীরের অপকার ঘটে। নিদ্রিত শিশুর এই অসংবৃত বদন কোন প্রকার সদুপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। শিশুর নিদ্রা গভীর হওয়া আবশ্যক। নিদ্রা কালে যেন কোন প্রকার ব্যাঘাত না হয়।

অহর্নিশ শিশুকে শয্যায় শায়িত করিয়া রাখাও ভাল নয়। ক্রোড়ে করিয়া ভ্রমণকালে স্বাস্থ্যকর ও নির্ম্মল বায়ুর-ক্রীড়াক্ষেত্র কোন মুক্তস্থানে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনার্থে লইয়া গেলে শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

শিশুর পরিচ্ছদ ও ক্রীড়া—এই শিশুচর্য্যায় কতিপয় বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। বহির্ভ্রমণ যাত্রাকালে শিশু যেন উপযুক্ত-রূপে সজ্জিত ও বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়। যেন শীতল পবন সেবনে শিশু কোন প্রকার ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইতে না পায়। উষ্ণ-তাপময় গৃহ হইতে সহসা শীতল মুক্তস্থানে বা শীতল বহিঃস্থান হইতে সহসা উষ্ণ কক্ষে আনয়ন করিলে শিশুর স্বাস্থ্যহানি হইবার সম্ভাবনা।

শিশুর বহির্ভ্রমণ কার্য্য প্রায়ই দাস-দাসীগণ দ্বারা সমাধা হইয়া থাকে। শিশু-মাতা নিরক্ষর ও অল্পবুদ্ধি দাস-দাসীগণের হস্তে আপন সন্তানের ভার দান করিবার পূর্ব্বে বহির্ভাগে শিশুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, ক্রোড়ে কিরূপভাবে রাখিতে হইবে বা শিশু-

শকটে শিশুকে কিরূপ ভাবে শায়িত করিতে হইবে ইত্যাদি তাহাদিগকে যেন বলিয়া দেন। অনেক সময়ে ভৃত্যবর্গের অজ্ঞতা দোষে বহু শিশুর সমূহ ক্ষতির কথা শুনা যায়। ভ্রমণকালে শিশুর কোন অঙ্গ যেন অনিয়-মিতরূপে বিন্যস্ত না হয়। বহু ভৃত্য শিশুকে এরূপে ক্রোড়ে করে বা যানে শায়িত করে যে, তাহার মস্তক বাঁকিয়া থাকে, হস্ত ও পদদ্বয় কুঞ্চিত হইয়া থাকে। কখনও বা শিশুর চক্ষে সূর্য্য কিরণ পড়ায়, দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধনের পথ রুদ্ধ হয়। আবার ক্ষুদ্র শকট যদি সতর্কভাবে চালিত না হয় কিম্বা শিশুর দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অত্যধিক পরিমাণে নাড়াচাড় পায়, তাহা হইলেও অত্যন্ত বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। আর এই সময়ে শিশুর হস্তে নানাবর্ণে রঞ্জিত ক্রীড়া দ্রব্য দেওয়া হয়, ইহা না দেওয়াই ভাল; কারণ, ক্রীড়ার দ্রব্যসকল প্রায়ই নানা বিষাক্ত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। শিশু হস্তে কোন বস্তু পাইলেই তাহার আস্বাদ গ্রহণ না করিয়া তৃপ্ত হয় না; সকলের সহিত পরিচয় করিতে চায়, সুতরাং সেই ক্রীড়া দ্রব্যের উপর তাহার জিহ্বা পতিত হয়। বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে যে অনিষ্ট হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এই প্রকার ক্রীড়াদ্রব্য প্রদান না করাই শ্রেয়স্কর।

অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত আমাদের দেশে Feeding bottle ও Dummy teat (রবারের কৃত্রিম স্তনের বোঁটা) বহু পরিমাণে শিশুদের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। শিশুদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য এই কৃত্রিম রবারের বোঁটা সদা সর্ব্বদা চুষিতে দেওয়া হয়। তাহাকে চলিত কথায় Comforter বলে। ইহা ব্যবহার করা কদাচ উচিত নহে। ইহার ব্যবহারে নানা প্রকার দোষ ও ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে। তন্মধ্যে কয়েকটীর পরিচয় নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১। ইহার ব্যবহারে দন্তপাটী উচ্চ ও বিসদৃশ হয়;—কারণ ইহা দন্ত বাহির হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে চাপ দ্বারা বিকৃত করিয়া দেয়।

২। ইহার দ্বারা উপরের চোয়াল ও মুখগহ্বর বিকৃত হইতে পারে।

৩। যদি কোন কারণে ইহা মেজেতে পড়িয়া যায় পরে তাহা লইয়া পুনরায় যখন শিশু মুখমধ্যে অর্পিত হয়, তখন তাহার সহিত নানা প্রকার রোগের বীজাণুও শরীরে প্রবেশ করে।

৪। ইহা চুষিবার জন্য শিশু বায়ু ভক্ষণ করে ও সেইজন্য তাহাদের পেট ফাঁপিয়া যায়।

৫। সদা সর্ব্বদা ইহা চুষিবার জন্য শিশুর পাকস্থলী বিশ্রাম পায় না।

৬। ইহা শিশুকে মুখ দিয়া নিশ্বাস লইতে অভ্যস্ত করায় ও তজ্জন্য নাসাগহ্বরের পশ্চাতে মাংসার্ব্বুদ (Adenoid) জন্মিয়া থাকে।

৭। ইহা স্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক; কোন মতেই ইহার ব্যবহার হওয়া উচিত নহে, এবং ইহার কোন আবশ্যকতা নাই।

শিশুর স্নান—ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুকে ঈষদুষ্ণ জলে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া স্নান করাইতে হইবে। এবং পরে শুষ্ক কাপড় দিয়া উত্তমরূপে মুছাইয়া লইতে হইবে। পরে শিশুর শরীরের অবস্থা বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে তৈল মর্দ্দনান্তে গাত্র মুছাইয়া দিতে পারিবে। শিশুকে কদাচ সাবান মাখাইয়া বা অধিকক্ষণ যাবৎ ঠাণ্ডা জলে স্নান করাইবে না। এইরূপ সাবান মাখানর পর অনেক শিশু জ্বর ও নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণ হারাইয়াছে।

শিশু বেশ সবল ও সুস্থ থাকিলে এবং আকাশ নির্ম্মল ও রৌদ্রদক্ত থাকিলে সপ্তাহে একবার সূর্য্যপক্ক বা ঈষদুষ্ণজলে শিশুকে স্নান করান যাইতে পারে। তবে স্নানের সময় যত সংক্ষেপে হয় ততই উত্তম। স্নানের পর জল উত্তমরূপে শুষ্ক কাপড় দ্বারা মুছাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রণালীতে শিশুকে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত স্নান করান বিধেয়।

শিশুর আহার—প্রকৃতি মাতৃস্তনে শিশুর যথোপযুক্ত আহার প্রদান করিয়া থাকেন। মাতৃদুগ্ধই শিশুর উপযুক্ত আহার। কিন্তু দুঃখের

বিষয়, মাতৃদুগ্ধ পান বহু শিশুর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। মাতা অসুস্থ থাকিলে বা দুগ্ধে কোন প্রকার দোষ থাকিলে চিকিৎসকগণের মতানুসারে শিশু সেই দুগ্ধ পান করিতে পায় না। কাজেই গো দুগ্ধ পান দ্বারা তাহাকে জীবিত থাকিতে হয়।

শিশুর দুগ্ধ পান বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম পালন করা আবশ্যক। দুগ্ধ পান ক্রিয়া যেন নিয়মিতরূপে নির্দ্ধারিত কালে সম্পাদিত হয়। কোন নিয়ম না মানিয়া মাতা যদি আপন ইচ্ছানুসারে শিশুকে দুগ্ধপান করান, তাহা হইলে শিশুর ভাবী অমঙ্গল ধ্রুব জানিতে হইবে। দুগ্ধ যেন অতি মাত্রায় পান করান না হয়। দুই মাসের শিশুকে অন্ততঃ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর দুগ্ধ পান করাইবে। তিনমাস বয়সে তিন ঘণ্টা অন্তর পান করাইতে পারা যায়। রাত্রিকালে দুইবার পান করানই যথেষ্ট। শিশু কোন আঘাত প্রাপ্ত হইলে বা অন্য কোন কারণে ক্রন্দন করিলে মাতা স্তনপান করাইয়া ভুলাইতে চেষ্টা করেন, ইহা অনুচিত। যথাকালে স্তনপান না করাইয়া এরূপভাবে যখন তখন স্তনপান করাইলে শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হয় না।

শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে গো দুগ্ধপানের উপযুক্ত হয়, কিন্তু যদি কোন কারণে অনুপযুক্ত সময়ে প্রকৃত নির্দ্ধারিত মাতৃদুগ্ধের বিনিময়ে গোদুগ্ধ বা ছাগী দুগ্ধ বা অন্য দুগ্ধ পান করাইতে হয়, তখন দুগ্ধকে তরল করিয়া শিশুর পরিপাকশক্তির অনুযায়ী করিয়া লইতে হইবে।

যে গাভীর দুগ্ধ পান করাইবে সেই গাভী যেন সুস্থ ও সবল হয়। দুগ্ধ ও দুগ্ধপাত্র সর্ব্বদা অত্যন্ত পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে।

স্নানের ঠিক পরেই দুগ্ধ পান করান বিধেয় নহে; অন্ততঃ ১ ঘণ্টা পরে দুগ্ধপান করাইবে।

শিশুকে দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার খাদ্য প্রদান করিলে অনিষ্ট হয়। কারণ শিশুর পাকস্থলী দুগ্ধ পরিপাক করিতেই সক্ষম হইয়া থাকে।

ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত দন্তোদ্গম হইলে অন্য নানা প্রকার খাদ্য ভক্ষণ করাইলেও কোনরূপ ক্ষতি হয় না। এবং ক্রমশঃ তাহা অভ্যাস করান আবশ্যক।

শিশুর ক্রমবিকাশ অবস্থায়—যখন তাহাদের দাঁত উঠিল এবং অল্প অল্প করিয়া সকল খাদ্য দ্রব্যই খাইতে আরম্ভ করিল তখন নিম্নলিখিত দোষ ও কদভ্যাস যাহাতে শিশুর অভ্যাস না হয় তাহার জন্য বিশেষ যত্ন লইতে হইবে।

১। চিবাইয়া না খাওয়া। ২। তাড়াতাড়ি খাওয়া। ৩। ঢোক ঢোক করিয়া আস্তে আস্তে না খাইয়া তাড়াতাড়ি দুগ্ধ গিলিয়া খাওয়া। ৪। খাইতে বসিয়া বৃথা সময় কাটান। ৫। আঙ্গুল চোষা। ৬। খাদ্যদ্রব্য ছড়াইয়া ফেলা। ৭। নূতন খাদ্য খাইতে অনিচ্ছা। ৮। তরকারি খাইতে অনিচ্ছা। ৯। মিষ্ট দ্রব্যে ও বাজারের খাবারে লোভ।

শিশুগণকে আহার করাইবার সময় অভিভাবকদের নিম্নলিখিত দোষ গুলি প্রায় দেখা যায়। এই সকল দোষ হইতে শিশুদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

১। অতি ভোজন—বেশী করিয়া খাওয়ান।

২। যখন তখন খাইতে দেওয়া।

৩। শিশুর পছন্দ মত খাদ্যাদি খাইতে দেওরা বা পরিত্যাগ করিতে দেওয়া।

৪। অধিক পরিমাণে দুগ্ধ খাইতে দেওয়া।

৫। চিবাইয়া খাইবার খাদ্য না দেওয়া বা অল্প দেওয়া।

৬। ক্ষুধা না থাকিলে বা ক্লান্ত অবস্থায় বা অসুস্থ অবস্থায় ভুলাইয়া খাওয়ান।

শিশুর শত্রু

Baby Soothers or Comforters

কদাচ ব্যবহার করাইও না

(৬১ পৃষ্ঠা দেখুন)

১। ইহার ব্যবহারে দন্তপাটী উচ্চ ও বিসদৃশ হয় কারণ ইহা দন্ত বাহির হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে চাপ দ্বারা বিকৃত করিয়া দেয়।

২। ইহার দ্বারা উপরের চোয়াল ও মুখগহ্বর বিকৃত হইতে পারে।

৩। যদি কোন কারণে ইহা মেজেতে পড়িয়া যায়, পরে তাহা লইয়া পুনরায় যখন শিশুর মুখমধ্যে অর্পিত হয়, তখন তাহার সহিত নানা প্রকার রোগের বীজাণুও শরীরে প্রবেশ করে।

৪। ইহা চুষিবার জন্য শিশু বায়ু উদরস্থ করে ও সেইজন্য তাহাদের পেট ফাঁপিয়া যায়।

৫। সদা সর্ব্বদা ইহা চুষিবার জন্য শিশুর পাকস্থলী বিশ্রাম পায় না।

৬। ইহা শিশুকে মুখ দিয়া নিশ্বাস লইতে অভ্যস্ত করায় ও তজ্জন্য নাসাগহ্বরের পশ্চাতে মাংসার্ব্বুদ (Adenoid) জন্মিয়া থাকে।

৭। ইহা স্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক ; কোন মতেই ইহা ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে, এবং ইহার কোন আবশ্যকতা নাই।

শিশুর কৃত্রিম আহার শোধণ কারবার সরঞ্জাম।

(Sterilising outfit)
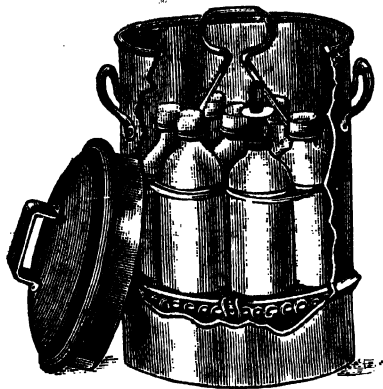
ইহার বিবরণ ৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এই ফিডিং বোতল শিশুর কৃত্রিম আহারের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে—
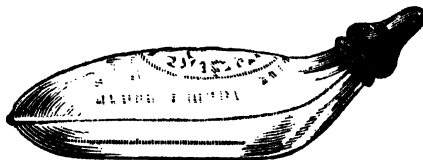
রবারের নলযুক্ত ফিডিং বোতল।

ইহা শিশুর চিরশত্রু।

দুগ্ধ নলের মধ্য দিয়া যাইবার সময় রোগ বীজাণু দ্বারা দূষিত হয়, দূষিত দুগ্ধ—পেটের অসুখ, কলেরা ও নানা প্রকার ব্যাধি এবং শিশুর মৃত্যু আনয়ন করে।

অষ্টম অধ্যায়।

শিশুর কৃত্রিম আহার।

মাতৃস্তন্যই শিশুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও স্বাভাবিক আহার; কিন্তু অনেক সময়ে আমাদিগকে শিশু-পালনের জন্য বাধ্য হইয়া কৃত্রিম খাদ্য ব্যবহার করিতে হয়। যে যে অবস্থায় মাতৃস্তন্যের অভাব হইতে পারে বা পান করা অবিধেয় হয়, আমরা নিম্নে তাহাদের কতকগুলির উল্লেখ করিলাম।

১। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর মাতার মৃত্যু ঘটিলে।

২। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যাধিতে মাতা অতিশয় দুর্ব্বল হইলে শিশুকে স্তন্যদান করা বিধেয় নহে। কিন্তু সামান্য অসুখ হইলে স্তন্যদানে বিরত হওয়া জননীর পক্ষে কর্ত্তব্য নহে।

৩। মাতার মৃগী (epilepsy) প্রভৃত ব্যাধি থাকিলে শিশুকে স্তন্যদান করা উচিত নহে।

৪। স্তনে প্রদাহ বা স্ফোটক হইলে জননী স্তন্য দানে অক্ষম হইয়া পড়েন; কাজেই তখন স্তন্য অদেয়।

৫। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার মাস কতক পরে পুনরায় মাতার ঋতু হইলে স্তনে দুগ্ধের অভাব হইয়া থাকে; কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও স্তন্যদান বন্ধ করা বিধেয় নহে।

৬। মাতার পুনরায় গর্ভ হইলে দুগ্ধের পরিমাণ হ্রাস পায়। এরূপ ক্ষেত্রে স্তন্যদান বন্ধ না করিলে মাতার, ক্রোড়স্থ শিশুর ও গর্ভস্থ শিশুর—তিনজনেরই স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে। এজন্য স্তন্যদান বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

৭। কোন কোন জননীর স্তনে স্বভাবতঃই দুগ্ধের অভাব দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় কৃত্রিম খাদ্যের প্রয়োজন হইলেও শিশুকে স্তন্য দেওয়া বন্ধ করা উচিত নহে।

অতি পুরাকালেও মাতৃদুগ্ধের অভাব হইলে অচিরপ্রসূ গো, মহিষী, ছাগী বা গর্দ্দভীর দুগ্ধ শিশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। ভল্লুক, নেকড়ে বাঘ প্রভৃতির দুগ্ধেও মনুষ্য শিশু পালিত হইয়াছে এরূপ গল্প শোনা যায়। খাঁটি গোদুগ্ধ শিশুর উপযোগী নহে। এজন্য গোদুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিবার ব্যবস্থা বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে। খাঁটি গোদুগ্ধে জল মিশ্রিত করিলে তাহা শিশুর উপযোগী কেন হয়, সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমাদের বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতির ফলে, এ সম্বন্ধে প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ হয়। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা গোদুগ্ধে দ্বিগুণের অধিক আমিষ জাতীয় উপাদান (ছানা) বর্ত্তমান আছে। এই কারণে পূর্ব্বে শিশুর আহারের জন্য গোদুগ্ধের সহিত সম পরিমাণ জল মিশ্রিত করিবার উপদেশ দেওয়া হইত। ক্রমে পরীক্ষা দ্বারা বৈজ্ঞানিকেরা দেখিলেন যে আমিষ জাতীয় উপাদানই যে দুগ্ধের একমাত্র পুষ্টিকর পদার্থ তাহা নহে। দুগ্ধের স্নেহ ও শালি জাতীয় উপাদানও বিশেষ পুষ্টিকর। গোদুগ্ধের সহিত সমপরিমাণ জল মিশ্রিত করিলে তাহার আমিষ উপাদান মাতৃদুগ্ধের সমতুল্য হইলেও স্নেহ ও শালি জাতীয় উপাদানে তাহা মাতৃদুগ্ধের ন্যায় হয় না। স্নেহ, শালি ও আমিষ জাতীয় উপাদান গোদুগ্ধে ও মাতৃদুগ্ধে শতকরা কি কি পরিমাণে বর্ত্তমান আছে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

	আমিষ উপাদান Proteins	শালি উপাদান Carbohydrates	স্নেহ উপাদান Fats
গোদুগ্ধে ...	৪	৩·৫	৬·৫
মাতৃদুগ্ধে —	১·৫	৭	৩·৫

কি উপায়ে গোদুগ্ধ রাসায়নিক উপাদানে মাতৃদুগ্ধের অনুরূপ হইতে পারে সে সম্বন্ধে ডাক্তার Meiggs নামক একজন চিকিৎসক কতকগুলি পরীক্ষা করেন। একটী সরু ও লম্বা (cylindrical) পাত্রে গোদুগ্ধ কিয়ৎকাল রাখিয়া দিলে দুগ্ধের মাখন বা স্নেহময় উপাদান উপরে ভাসিয়া উঠে। উপরের দুগ্ধ আস্তে আস্তে ভিন্ন পাত্রে ঢালিয়া লইলে দেখা যায় যে তাহাতে স্নেহময় উপাদান সাধারণ গোদুগ্ধ অপেক্ষা অনেক অধিক। ডাক্তার Meiggs দেখিলেন যে, ৩ ভাগ এরূপ দুগ্ধের সহিত সামান্য পরিমাণ দুগ্ধ শর্করা ও সমপরিমাণ জল মিশ্রিত করিলে যে দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহার রাসায়নিক উপাদান অনেকটা মাতৃদুগ্ধের অনুরূপ। এই উপায়ে প্রস্তুত দুগ্ধে শতকরা ১·৩ ভাগ আমিষ উপাদান, ৩ ভাগ স্নেহ উপাদান ও ৬ ভাগ শালি উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃত্রিম খাদ্য দ্বারা শিশুপালন যে কতদূর যত্ন-সাপেক্ষ তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কোন্ কোন্ বিষয়ে কৃত্রিম খাদ্য মাতৃদুগ্ধের অনুরূপ হইতে পারে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে বা মাতৃস্তন্যের সমতুল্য হইতে পারে না, আমরা নিম্নে তাহার আলোচনা করিলাম।

১। রাসায়নিক উপাদানে মাতৃদুগ্ধের অনুরূপ খাদ্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

২। মাতৃদুগ্ধের ন্যায় বা তদপেক্ষাও সহজে জীর্ণ হয় এরূপ খাদ্য প্রস্তুত করাও সম্ভব।

৩। মাতৃদুগ্ধের ন্যায় বীজাণুশূন্য খাদ্য প্রস্তুত করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার।

৪। মাতৃদুগ্ধের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা শিশুর পাকস্থলীকে ক্রমশঃ অন্যান্য খাদ্য গ্রহণের পক্ষে উপযোগী করিয়া তোলে।

মনুষ্য প্রাপ্ত-বয়স্ক হইলে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য আহার করিয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য দ্রব্য পরিপাক করিবার ক্ষমতা, শিক্ষা

ও অভ্যাস-সাপেক্ষ। এই উদ্দেশ্যে শিশুর খাদ্য এরূপভাবে নির্ব্বাচন করা উচিত, যেন তাহার পাকস্থলী ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন প্রকার আহার্য্য দ্রব্য পরিপাকে সমর্থ হয়। অনেক কৃত্রিম খাদ্য শিশুর পক্ষে আপাততঃ উপযোগী হইলেও তাহা শিশুর পাকস্থলীকে পুর্ব্বোক্ত প্রকারের শিক্ষা-দানের পক্ষে অনুপযোগী। খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের উপযোগী করিতে হইলে যাহাতে তাহা পাকস্থলী-নিঃসৃত পাচক রসের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইতে পারে সেরূপ করা কর্ত্তব্য। এজন্য পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছিবামাত্র তাহা আলোড়িত হইতে থাকে; এবং খাদ্যদ্রব্য যত গুরুপাক হয় এই আলোড়নও ততই অধিক হইতে দেখা যায়। শিশুর স্বাভাবিক খাদ্যের বিশেষত্ব হেতু পাকস্থলী ক্রমে ক্রমে এরূপ আন্দোলনে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু কৃত্রিম খাদ্যে সাধারণতঃ এ গুণ দেখা যায় না। পাকস্থলীর আরও একটী শিক্ষা আবশ্যক; তাহা এই যে, পরিপাক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে পর পাকস্থলী যেন কিয়ৎকাল বিশ্রাম লাভ করে; কিন্তু এরূপ বিশ্রাম লাভ করিবার ক্ষমতাও শিক্ষা-সাপেক্ষ এবং তাহা খাদ্যের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন প্রকারের প্রাণীদিগের দুগ্ধে উক্ত উপাদান সকলের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এজন্য প্রত্যেক প্রাণীর দুগ্ধ নিজ নিজ শাবককে স্বাভাবিক খাদ্যে অভ্যস্ত করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী; অন্যের জন্য নহে।

গাভী সমস্ত দিন তৃণ ইত্যাদি ভক্ষণ করে এবং রাত্রে তাহা রোমন্থন করিয়া থাকে। তৃণাদির ন্যায় দুষ্পাচ্য সামগ্রী রোমন্থন ও পরিপাক করিবার জন্য শিক্ষার আবশ্যক। গোদুগ্ধ গোবৎসকে এরূপ শিক্ষাদানের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী। গোদুগ্ধ দেখিতে তরল হইলেও পাকস্থলীতে যাইয়া রেনেট (Rennet) নামক পাচক পদার্থের সংস্পর্শে আসিলে অতিশয় কঠিন ভাবে চাপ বাঁধিয়া যায়। এরূপ কঠিন পদার্থ পরিপাকে অভ্যস্ত হইলে বৎস ক্রমে ক্রমে খড় ঘাস ইত্যাদি পরিপাকে সমর্থ হইয়া

থাকে। খাঁটি গোদুগ্ধ তৃণভোজী গোবৎসের উপযোগী আহার হইলেও তাহা মনুষ্য-শিশুর পক্ষে কদাচ উপযোগী হইতে পারে না। অনুপযুক্ত খাদ্য পাকস্থলীতে পৌঁছিলে পাকাশয়ের সমূহ অনিষ্ট ঘটিতে পারে। এই কারণে কত শিশু যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

গোদুগ্ধ গোবৎসের পাকস্থলীতে যেরূপ কঠিন চাপে পরিণত হয় মনুষ্য-শিশুর উদর মধ্যেও তাহার সেইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে।

কৃত্রিম খাদ্যে শিশুপালন করিতে হইলে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন সদ্যোজাত শিশুর উদরে খাদ্য দ্রব্য কোনরূপ চাপ বাঁধিতে না পায়।

এই জন্য গোদুগ্ধের আমিষাংশের পাকস্থলীতে যাহাতে বড় বড় চাপ না বাঁধে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা নিম্নলিখিত উপায়ে হইতে পারে :—

১। দুগ্ধের সহিত Citrate of soda মিশাইলে তাহা অতি সূক্ষ্ম ভাগে চাপ বাঁধে। ১ আউন্স মিশ্রিত দুগ্ধে ১ গ্রেন Citrate of soda মিশাইতে হয়।

২। বালির জল :—১ ড্রাম কাঁচা যবের সূক্ষ্ম চূর্ণ জলে গুলিয়া পরে তাহাতে ফুটন্ত জল ২০ আউন্স মিশাইয়া ৫ মিনিট সিদ্ধ করিবে ও অনবরতঃ নাড়িবে। সাধারণ জলের পরিবর্ত্তে এই জল দিয়া গোদুগ্ধ পাতলা করিলে তাহা অতি সূক্ষ্ম ভাবে চাপ বাঁধিবে।

৩। চাউল সিদ্ধ জল :—½ ছটাক ধোওয়া চাউল ২০ আউন্স গরম জলে তিন ঘণ্টা কাল ভিজান থাকিবে। পরে তাহাকে ১ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া ভাত ছাঁকিয়া লইবে ও জলটুকু গোদুগ্ধ পাতলা করিবার জন্য ব্যবহার করিবে।

নবপ্রসূত শিশুকে এক ভাগ গোদুগ্ধের সহিত ৩ ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া দেওয়া চলে। শিশুর পরিপাক ক্ষমতা অল্প হইলে

এতদপেক্ষাও অধিক জল মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। একেবারেই শিশুকে কৃত্রিম খাদ্যে পালন করা অপেক্ষা প্রথমে দিনকতক মাতৃস্তন্য পান করাইয়া পরে গোদুগ্ধে পালন করা অনেক সহজ। কৃত্রিম খাদ্যের একটী সুবিধা এই যে, আবশ্যকমত তাহার উপাদান শিশুর পরিপাক শক্তির উপযোগী করা যাইতে পারে।

বিলাতী নানা প্রকারের patent food ব্যবহারে কত শিশুর স্বাস্থ্য যে চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া যায় তাহা বলা যায় না। Patent food মুখরোচক ও সহজে হজম হয় এ কথা সত্য; কিন্তু ইহা পরিপাক শক্তির ক্রমবিকাশের পক্ষে একেবারেই অনুপযোগী। এরূপ খাদ্যে পালিত শিশুর স্বাস্থ্য আপাততঃ ভাল হইলেও, পরিণামে তাহা বিফল হইয়া যায়। Patent food পালিত শিশুকে অতিরিক্ত মেদবৃদ্ধির জন্য হৃষ্টপুষ্ট দেখায়। কিন্তু মেদবৃদ্ধি স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

শিশুর পুষ্টি—শিশুর খাদ্য এরূপ ভাবে নির্ব্বাচন করা উচিত, যেন শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহার স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকে। প্রাণিগণের দুগ্ধ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের বৃদ্ধির হার ও পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা অনুসারে দুগ্ধে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। যে প্রাণীর বৃদ্ধি অধিক তাহার দুগ্ধে আমিষ উপাদানও অধিক।

বয়স্ক ব্যক্তির খাদ্যে মৎস্য, মাংস বা ডিম্ব যেরূপ, শিশুর খাদ্যে দুগ্ধের ছানাও সেইরূপ। ছানা (Casein) ব্যতীত দুগ্ধে Lact-albumin ও Lact-globulin নামক আরও দুই প্রকার আমিষ উপাদান বর্ত্তমান আছে। ছানা কাটিবার সময় ইহারা জমাট না বাঁধিয়া তরল অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। শিশুর শরীর বৃদ্ধির জন্য ও শরীরের ক্ষয় পূরণের জন্য দুগ্ধের আমিষ উপাদান আবশ্যক। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা শিশুর বৃদ্ধির হার অধিক এবং এই কারণেই বয়স্ক ব্যক্তির খাদ্যের তুলনায় শিশুর খাদ্যে

অর্থাৎ দুগ্ধে আমিষভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক দেখা যায়। শিশুকে দুগ্ধের এই আমিষভাগ পরিপাক করিতে শিক্ষা দেওয়া বিশেষ ভাবে উচিত।

প্রাণিগণের বৃদ্ধির হারের অনুপাতে খাদ্যে আমিষ উপাদানের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মেষশাবক মনুষ্য-শিশু অপেক্ষা তিনগুণ এবং কুক্কুরশাবক পাঁচগুণ অধিক পরিমাণে আমিষ উপাদান পাইয়া থাকে। আমিষ উপাদানের অভাব হইলেও বৃদ্ধি হইতে পারে ; কিন্তু এ অবস্থায় মাংসপেশীর পরিবর্ত্তে মেদ বৃদ্ধিই অধিক হইতে দেখা যায়। বিলাতী পেটেণ্ট ফুডের বিজ্ঞাপনে যে সকল শিশুর ছবি দেখা যায় সাধারণে তাহাদের দেহ খুব হৃষ্টপুষ্ট মনে করিলেও, বাস্তবিক তাহাদের শরীরে মেদই অধিক এবং মাংসপেশীর পরিমাণ নিতান্ত অল্প। সুস্থ শিশু সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকে ও হাত পা নাড়িতে ভালবাসে এবং তাহার পেশীসমূহ অতিরিক্ত মেদ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে না।

অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবে বলিয়া ব্যবসায়ীগণ মেষশাবক প্রভৃতিকে শালি ও স্নেহ-প্রধান খাদ্য দিয়া থাকে। ইহাতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা হৃষ্টপুষ্ট হয়। এই সকল মেষশাবকের শারীরিক বৃদ্ধির ও পুষ্টির কোন প্রকার ব্যাঘাত আপাততঃ দৃষ্ট না হইলেও ইহারা অতি সহজেই পীড়িত হইয়া পড়ে এবং মরিয়া যায়। এই সকল মেষের দেহ হইতে যে মাংস পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ সামান্য।

খাদ্যের কোন্ কোন্ উপাদান শরীরের গঠনে সহায়তা করে তাহা নির্ণয়ের জন্য আমেরিকার Henry নামক একজন সাহেব কতকগুলি পরীক্ষা করেন। কতকগুলি শূকর-শাবককে তিনি পেটেণ্ট ফুড জাতীয় খাদ্যে পালিত করেন এবং অপর কতকগুলিকে উপযুক্ত পরিমাণে আমিষ জাতীয় খাদ্য দেন। পরে এই শূকরগুলি বড় হইলে তাহাদের মারিয়া তাহাদের মৃতদেহ পরীক্ষা করা হয়। যে সকল শূকর উপযুক্ত পরিমাণে আমিষ উপাদান পাইয়াছিল তাহাদের শরীরে রক্তের পরিমাণ অপর

শূকর অপেক্ষা প্রায় শতকরা ৩৩ ভাগ অধিক ছিল এবং তাহাদের মাংস-পেশীও অপর শূকর অপেক্ষা ওজনে অধিক হইয়াছিল। পরীক্ষা দ্বারা আরও দেখা গেল যে, ইহাদের হাড়ও অন্য শূকরগুলির হাড় অপেক্ষা অনেক শক্ত।

দুগ্ধে যে স্নেহ উপাদান আছে তাহা পৃথক করিলে মাখন পাওয়া যায়। দুগ্ধে ইহা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুরূপে ভাসমান থাকে বলিয়া অতি সহজেই জীর্ণ হয়। মাখন, কডলিভার অয়েল প্রভৃতি স্নেহময় পদার্থও শিশুরা আবশ্যকমত পরিপাক করিতে পারে।

খাদ্যের স্নেহ উপাদান হইতেই শরীরের উত্তাপ জন্মে। শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীগণ স্বভাবতঃই অধিক পরিমাণে স্নেহময় খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। খাদ্যে স্নেহময় উপাদান থাকার জন্য অনেকটা কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর পুষ্টিও স্নেহময় উপাদানের উপর নির্ভর করে। খাদ্যে স্নেহময় পদার্থের অভাব ঘটিলে শারীরিক পুষ্টির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে এবং Rickets প্রভৃতি নানারূপ ব্যাধি হইতে দেখা যায়।

গোদুগ্ধে ও মাতৃদুগ্ধে স্নেহ উপাদান প্রায় সমান; এজন্য গোদুগ্ধে জল মিশ্রিত করিলে মাতৃদুগ্ধের তুলনায় তাহার স্নেহ উপাদান কমিয়া যায়। এজন্য জলমিশ্রিত দুগ্ধ শিশুর আহার্য্য রূপে ব্যবহার করিতে হইলে তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে স্নেহ পদার্থ মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। বিলাতে এই উদ্দেশ্যে Cream ব্যবহৃত হইয়া থাকে। Creamএ দুগ্ধের স্নেহভাগ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। প্রত্যেক বার জলমিশ্রিত দুগ্ধের সহিত চা খাইবার চামচের এক চামচ পরিমাণ ক্রিম দেওয়া কর্ত্তব্য।

দুগ্ধ শর্করা, চিনি, গুড়, মধু, মল্ট, শ্বেতসার প্রভৃতি শালিজাতীয় খাদ্য। শালিজাতীয় খাদ্যের মধ্যে কতকগুলি জলে দ্রবণীয় ও মিষ্ট স্বাদ-যুক্ত; আর অন্যগুলি জলে অদ্রবণীয়। সকলপ্রকার শালিজাতীয় খাদ্যই পরিপাক প্রাপ্ত হইলে একপ্রকার শর্করায় পরিণত হয় এবং শর্করারূপেই

শরীর মধ্যে গৃহীত হইয়া থাকে। শিশুরা কিছুকাল যাবৎ শ্বেতসারের ন্যায় অদ্রবণীয় শালিজাতীয় খাদ্য পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু চিনি, মধু, প্রভৃতি দ্রবণীয় ও মিষ্ট শালি খাদ্য শিশুরা জীর্ণ করিতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির অন্ত্রমধ্যে শ্বেতসারের ন্যায় অদ্রবণীয় শালি খাদ্য-সমূহ বিশেষ প্রকার জারক পদার্থের সাহায্যে দ্রবণীয় শর্করায় পরিণত হয়। শিশুর অন্ত্রমধ্যে প্রথমে সেরূপ কোন জারক পদার্থ থাকে না; এজন্য তাহাকে অদ্রবণীয় শালি খাদ্য দিতে হইলে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। প্রথমে দুগ্ধের সহিত সামান্য পরিমাণ বালীর জল দেওয়া যাইতে পারে। পরে শিশুর বয়স দশমাস হইলে তাহাকে অল্পে অল্পে ভাত ও অন্যান্য শালি খাদ্যে অভ্যস্ত করান যাইতে পারে।

শর্করা প্রভৃতি শালিজাতীয় খাদ্য শরীরের গঠন বিষয়ে সহায়তা না করিলেও শরীরের শক্তি-বিশেষের পুষ্টি পক্ষে সাহায্য করে। কয়লা হইতে যেরূপ এঞ্জিনের শক্তি উৎপন্ন হয় আমাদের শরীরের কার্য্যকরী ক্ষমতাও সেইরূপ শালিজাতীয় খাদ্য হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক মনুষ্যকে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়, এজন্য তাহার খাদ্যে শালি উৎপাদনের পরিমাণও অধিক। কিন্তু শিশুর পরিশ্রমের মাত্রা সামান্য এজন্য ভগবান্ মাতৃ-দুগ্ধে আবশ্যক অনুযায়ী শালি উপাদান দুগ্ধ শর্করা রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। পেটেণ্ট ফুড প্রভৃতিতে শর্করার পরিমাণ মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা অনেক অধিক। শিশুর খাদ্যে আমিষ উপাদানের আধিক্য থাকিলে শিশু বমন করিয়া তাহা বাহির করিয়া দেয় এবং এই কারণে তাহার কোন অনিষ্ট হয় না; কিন্তু খাদ্যে শর্করার আধিক্য থাকিলে তাহা শরীর মধ্যে গৃহীত হইয়া থাকে এবং আবশ্যকের অতিরিক্ত অংশ কিয়ৎপরিমাণে মেদরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া শরীরমধ্যে সঞ্চিত হয় এবং অবশিষ্টভাগ সেই উপাদানের ন্যায় শরীর মধ্যে দগ্ধ হইয়া উত্তাপ উৎপন্ন করে। এই কারণেই খাদ্যে অধিক পরিমাণ শর্করা থাকিলে শিশুর অতিরিক্ত ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইতে দেখা যায়।

শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে পরিমাণ লবণ জাতীয় খাদ্য আবশ্যক, গোদুগ্ধে তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে এই উপাদান বর্ত্তমান আছে। এজন্য গোদুগ্ধে জল মিশ্রিত করিলেও শিশুর লবণ উপাদানের কোন অভাব হয় না। লবণ জাতীয় উপাদানে অস্থির দৃঢ়তা সম্পাদন করে এবং শারীরিক পুষ্টির পক্ষেও ইহার আবশ্যকতা অধিক। সাধারণের মধ্যে অনেকের ধারণা আছে যে, শিশুকে চূণের জল খাইতে দিলে তাহার অস্থি শক্ত হয়; কিন্তু ইহা সত্য নহে।

বোতল বা টিনে বহুদিন স্থিত খাদ্য নিরন্তর শিশুকে খাওয়াইলে তাহার পুষ্টির ব্যাঘাত হয় ও scurvy প্রভৃতি রোগ জন্মে। খাদ্যের সহিত অল্পপরিমাণেও টাট্‌কা দ্রব্য থাকিলে এ দোষ ঘটে না। কি উপাদানের জন্য টাট্‌কা খাদ্যের এই গুণ তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। খাদ্যদ্রব্যাদি অনেক দিন পর্য্যন্ত রাখিয়া দিলে তাহার এই গুণ নষ্ট হইয়া যায়। কাঁচা দুগ্ধেরও এই গুণ আছে; কিন্তু দুগ্ধ জাল দিলে তাহা অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। এ জন্য অনেকে শিশুকে গোদুগ্ধ কাঁচা খাওয়াইতে উপদেশ দেন; কিন্তু এই উপদেশ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না; কারণ কাঁচা দুগ্ধের সহিত ক্ষয় প্রভৃতি নানা রোগের বীজাণু শরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে এবং দুগ্ধ জাল দিলে যে দোষ হয়, সামান্য পরিমাণে টাটকা ফলের রস খাওয়াইলে তাহা নষ্ট হয়। টাটকা ফলের রস, মাংসের যূষ, এমন কি কাঁচা আলুর রস খাওয়াইলেও স্কার্ভী আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

শিশুর খাদ্য কিরূপ হওয়া উচিত, উপরি উক্ত আলোচনা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। এ বিষয়ে মাতৃদুগ্ধই আমাদের আদর্শ। শিশুর খাদ্যে শরীর গঠনের জন্য স্নেহ ও শালি উপাদান, অস্থি গঠন ও পুষ্টির জন্য লবণ উপাদান ও স্কার্ভী প্রভৃতি নিবারণের জন্য বিশেষ উপাদান সকল বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। এই সকল উপাদানের পরিমাণও যথাযথ ভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। শিশুর খাদ্য সহজপাচ্য হওয়া আবশ্যক; এবং

যাহাতে শিশুর পরিপাক-শক্তির ক্রমবিকাশ হইতে পারে খাদ্যের সেইরূপ গুণ থাকারও বিশেষ প্রয়োজন।

শিশুর খাদ্যের পরিমাণ ঃ—শিশুকে অধিক আহারে অভ্যস্ত করা বাঞ্ছনীয় নহে; বরং যাহাতে শিশু অল্প পরিমাণে খাদ্য খাইয়া, সুজীর্ণ করিয়া তাহা হইতে সমস্ত সারভাগ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যে ইঞ্জিন যত অল্প কয়লা খরচ করিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম, তাহা তত উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। সেইরূপ যে শিশু অল্প খাদ্যের সমস্ত প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহার পক্ষে অধিক খাদ্যের প্রয়োজন হয় না এবং তাহার শরীরও সুস্থ ও সবল হইয়া কার্য্যক্ষম হয়। অধিক মাত্রায় আহার করিবার ক্ষমতা অনেকটা অভ্যাস-সাপেক্ষ; এবং এইরূপ অভ্যাস আয়ত্ত করা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে। শিশুকে কত বয়সে কি পরিমাণে কি সংমিশ্রণে খাদ্য দিতে হইবে তাহা পরবর্ত্তী তালিকায় প্রকাশ করিলাম।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে জননীরা শিশুকে অতিরিক্ত পরিমাণে আহার দিয়া থাকেন; এবং যে খাদ্য দেন তাহাও শিশুর পক্ষে একেবারে অনুপযোগী। সুস্থ শিশুকে অতি অল্প পরিমাণে উপযুক্ত খাদ্যের দ্বারা পালন করা যাইতে পারে। অনেক সময় শিশুর অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ হইলে তাহার আহারের ইচ্ছা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; এরূপ অস্বাভাবিক ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য, উপবাস বা লঘু অল্প আহারই প্রকৃষ্ট উপায়। নিয়মিত সময়ে এবং উপযুক্ত পরিমাণে খাওয়াইলে শিশুর পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং পাকস্থলীরও নিয়মিত বিশ্রাম লাভ ঘটে। যে শিশু যত রুগ্ন তাহার খাদ্য পরিপাক করিতেও তত অধিক সময় লাগে। এ জন্য রুগ্ন শিশুকে সুস্থ ও সবল শিশু অপেক্ষা অধিকক্ষণ অন্তর লঘু ও অল্প খাদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

দূষিত দুগ্ধ—সাধারণতঃ বীজাণুর দ্বারাই দুগ্ধ দূষিত হইয়া পানের

অযোগ্য হয়। দুগ্ধ নানা প্রকার বীজাণু দ্বারা দূষিত হইতে পারে। গাভীর বাঁটে Streptococcus জাতীয় নানা প্রকার বীজাণু লাগিয়া থাকে এবং দোহন কালে তাহারা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হয়। গাভীর ক্ষয় রোগ থাকিলে দুগ্ধের সহিত এই রোগের বীজাণু আসিতে পারে। দোহন পাত্র, হস্ত, ধূলা প্রভৃতি হইতেও নানা প্রকার বীজাণু আসিয়া দুগ্ধ দূষিত করে। উপযুক্ত সুযোগ পাইলে এই সকল বীজাণু অতিদ্রুত বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে। ২৪ ঘণ্টায় একটী বীজাণু হইতে ১৭০০০০০০ বীজাণু জন্মিতে পারে।

তিন উপায়ে বীজাণুর বংশ বৃদ্ধি বন্ধ করা যাইতে পারে।

১ম। দুগ্ধে কোনরূপ বীজাণু বিনাশক ঔষধ মিশ্রিত করিলে বীজাণু বিনষ্ট হইতে পারে।

২য়। দুগ্ধকে ফুটাইয়া লইলে অথবা Pasteurise করিলেও বীজাণু বিনষ্ট হয়। Pasteurise করিতে হইলে দুগ্ধকে ৭০ ডিগ্রি উত্তাপে অল্প কাল রাখিতে হয়। ইহাতে দুগ্ধের বীজাণু বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু দুগ্ধের অপর কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

৩য়। দুগ্ধকে বরফের মধ্যে রাখিলে বীজাণুগণ বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে না।

ঔষধ দ্বারা দুগ্ধের বীজাণু নষ্ট করা যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, প্রত্যহ এরূপ বিষাক্ত ঔষধ মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিলে শিশুর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে। দুগ্ধ বরফের মধ্যে রাখিলে বীজাণুগণ বংশবৃদ্ধি করিতে না পারিলেও একেবারে মরিয়া যায় না, অথচ উপযুক্ত সুযোগ পাইলে পুনরায় সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। দুগ্ধ ফুটাইয়া লইলে সকল বীজাণুই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ফুটাইলে দুগ্ধের স্কার্ভী-নাশক গুণ নষ্ট হইয়া যায়। দুগ্ধ Pasteurise করিলে তাহার স্কার্ভী-নাশক গুণ ঠিক থাকে; কিন্তু বীজাণু

বিনষ্ট হয়। দুগ্ধ Pasteurise করিতে হইলে বিশেষ সরঞ্জামের আবশ্যক; এজন্য সাধারণের পক্ষে ইহা উপযোগী নহে।

দুগ্ধ ফুটাইয়া লওয়া উচিত কি না এ সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ লক্ষিত হয়। অনেকে বলেন দুগ্ধ জ্বাল দিলে তাহার পুষ্টিকারিতা কমিয়া যায়। দুগ্ধ ফুটাইলে বীজাণু নষ্ট হইলেও তাহাদের Spore বা ডিম্ব সহজে নষ্ট হয় না; এবং দুগ্ধ ঠাণ্ডা হইলে এই সকল Spore হইতে পুনরায় নূতন বীজাণুর উৎপত্তি হয়। এজন্য দুগ্ধকে একেবারে নির্দ্দোষরূপে বীজাণু-শূন্য করিতে হইলে, তাহা প্রথমবার ফুটাইয়া ৬।৭ ঘণ্টা রাখিবার পর পুনরায় জ্বাল দিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ কাঁচা দুগ্ধ অপেক্ষা শীঘ্র হজম হয় এবং শিশুকে কিঞ্চিৎ ফলের রস খাইতে দিলে তাহার স্কার্ভী বা তদ্রূপ কোন রোগ জন্মাইবারও সম্ভাবনা থাকে না।

মাতৃদুগ্ধের অভাব হইলে সাধারণতঃ গোদুগ্ধের দ্বারাই শিশুকে পালন করা হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, খাঁটি গোদুগ্ধ বা জল মিশ্রিত গোদুগ্ধ শিশুর উপযোগী আহার নহে।

কি উপায়ে গোদুগ্ধকে শিশুর খাইবার উপযোগী করা করা যাইতে পারে, আমরা নিম্নে তাহার আলোচনা করিলাম।

গোদুগ্ধের উপাদানের পরিমাণ সকল সময়ে একই প্রকারের থাকে না; সকল গাভীর দুগ্ধ সমান নহে এবং একই গাভীর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দুগ্ধের পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ বলিতে গেলে গোদুগ্ধে বিভিন্ন উপাদান সকল নিম্নলিখিত পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে; আমিষ উপাদান শতকরা ৪ ভাগ, স্নেহ উপাদান শতকরা ৩½ ভাগ, শালি উপাদান শতকরা ৪½ ভাগ। দুগ্ধকে লম্বা ও সরু পাত্রে রাখিয়া দিলে দুগ্ধের স্নেহ ভাগ উপরে ভাসিয়া উঠে এবং উপরের দুগ্ধ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তাহাতে শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ স্নেহ উপাদান বর্ত্তমানে আছে।

ইংরাজীতে এরূপ দুগ্ধকে ক্রিম বলে। যন্ত্র দ্বারা প্রস্তুত ক্রিমে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ স্নেহ উপাদান থাকিতে পারে। লম্বা পাত্রে রাখিয়া যে ক্রিম প্রস্তুত হয়, তাহাতে ১৬ ভাগ স্নেহ উপাদান ব্যতীত ৩.৬ ভাগ আমিষ ও ৪ ভাগ শালি উপাদান থাকে। এরূপ ক্রিম অতি সহজেই সকলেই প্রস্তুত করিতে পারেন।(৮১ পৃষ্ঠার চিত্র দেখুন)

মাতৃদুগ্ধে শর্করার পরিমাণ শতকরা প্রায় ৬·৫ ভাগ ; কিন্তু গোদুগ্ধে শর্করা ৪·৫ ভাগের অধিক থাকে না। এজন্য গোদুগ্ধে জল মিশ্রিত করিয়া তাহা মাতৃদুগ্ধের অনুরূপ করিতে হইলে, তাহাতে শর্করা মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধে সাধারণ শর্করা মিশ্রিত না করিয়া দুগ্ধ শর্করা মিশ্রিত করাই ভাল।

জন্ম হইতে শিশুকে গোদুগ্ধে পালন করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য এবং কি কি সরঞ্জাম আবশ্যক নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

১। ছয়টী ছোট বোতল রাখা যায় এরূপ একটী Tray বা অপর কোন পাত্র। ৮।১০ আউন্স মাপের বোতল হইলেই চলিবে।

২। শিশির মুখ বন্ধ করিবার জন্য কিছু পরিষ্কৃত তুলা। ইহার সহিত কাচের ছিপি থাকিলে ভাল হয়।

৩। এই শিশি কয়েকটী সমেত Trayখানি জলের মধ্যে বসাইয়া সিদ্ধ করিবার জন্য একটী বড় পাত্র ও তাহার ঢাকনা।

৪। এই বড় পাত্র, Tray ও শিশি ছয়টী একত্র করিয়া তাহার মধ্যে শিশির গলা পর্য্যন্ত জল দিয়া ফুটাইতে পারা যায় এইরূপ ১টী লোহার Stand ও Spirit Lamp।

প্রাতে একবার ও সন্ধ্যায় একবার টাটকা দুগ্ধ পাইলেই ভাল হয়। শিশুর জন্য যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট দুগ্ধ ব্যবহার করাই উচিত। দুগ্ধ পাইবামাত্র তালিকা অনুসারে তাহাতে দুগ্ধ শর্করা ক্রিম ও চুণের জল বা বার্লীর জল

শিশুর কৃত্রিম্ আহারের উপাদানের তালিকা নং ১। (৭৯ পৃষ্ঠা দেখুন)

শিশুর বয়স	১ দিন	২ দিন	৩ হইতে ৩০ দিন	২ মাস	৩ মাস	৪—৬ মাস	৬—৮ মাস	৮—১২ মাস
গোদুগ্ধ	০	০	১ আঃ ৪ড্রাম	৪ আঃ ৬ড্রাম	৪ আঃ ২ড্রাম	৫ আঃ ৪ড্রাম	১৩আঃ ৪ড্রাঃ	২৩ আউন্স
*ক্রিম (শতকরা ১৬ ভাগ ... স্নেহ উপাদান)	০	১ আউন্স	১ „ ৪„	৪ আঃ ২ড্রাম	৬ আঃ ৬ড্রাম	৮ আউন্স	৭আঃ ৪ড্রাম	৭ আউন্স
দুগ্ধ শর্করা	৩ ড্রাম	৪ ড্রাম	৬ ড্রাম	১ আঃ ২ড্রাম	১ আঃ ৭ড্রাম	২ আঃ ১ড্রাম	২ আঃ ৪ড্রাম	২আঃ ৪ড্রাঃম
২৪ ঘণ্টার পরিমাণ (বার্লী † বা চাউল সিদ্ধ জল মিশ্রিত করিয়া পূরণ করিতে হইবে)	৫ আউন্স	৮ আউন্স	১২ আউন্স	২৪ আউন্স	৩০ আউন্স	৩৬ আউন্স	৪২ আউন্স	৪৮ আউন্স
একবারে কি পরিমাণ খাওয়াইতে হইবে।	৪ ড্রাম	৬ ড্রাম	১½ আউন্স	৩ আউন্স	৩ আঃ ৪ড্রাম	৪ আঃ ৪ড্রাম	৬ আউন্স	৮ আউন্স
কতবার খাওয়াইত হইবে ...	৪	৬	১০	৮	৮	৮	৭	৬
কতক্ষণ অন্তর খাওয়াইতে হইবে।	৬ ঘণ্টা	৪ ঘণ্টা	৪ ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা.	৩ ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা	৩½ ঘণ্টা	৪ ঘণ্টা

* ৮১ পৃষ্ঠায় দুগ্ধ হইতে ক্রিম উঠাইবার সহজ উপায় চিত্র দ্বারা দেখান হইয়াছে। এই তালিকায় কৃত্রিম আহারের উপাদান সকল শিশুর বৃদ্ধির সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার দ্বারাই শিশুর পরিপাক শক্তির ক্রমবিকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে।

মিশ্রিত করিয়া ৬টী শিশিতে ভর্ত্তি করিতে হইবে। শিশু একবারে যে পরিমাণ আহার করিবে এক একটী শিশিতে সেই পরিমাণ মিশ্রিত দুগ্ধ থাকিবে। শিশির মুখগুলি তুলার দ্বারা বন্ধ করিয়া তাহা গলা পর্য্যন্ত পাত্রের মধ্যে জলে ডুবাইয়া পাত্রটি আগুনের উপর চড়াইয়া দিতে হইবে। জল ১০ মিনিট ফুটিলে শিশিগুলি Tray সমেত নামাইয়া পাত্রটি ঠাণ্ডা জলে পূর্ণ করিবে ও Tray সহিত শিশিগুলি পুনরায় ঠাণ্ডাজলে ডুবাইয়া রাখিবে। জল ফুটিবার সময় যাহাতে শিশিগুলি না পড়িয়া যায় তজ্জন্য সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। খাওয়াইবার সময় একটি শিশি বাহির করিয়া তাহা কিয়ৎকাল গরমজলে ডুবাইয়া রাখিলে দুগ্ধ গরম হইবে এবং তৎপরে তাহা Feeding Cup এ ভর্ত্তি করিয়া শিশুকে আস্তে আস্তে খাওয়াইতে হইবে। প্রত্যেক বার খাওয়াবার পর Feeding Cup উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য। খাওয়াইবার সময় রবারের চুষী (nipple) Feeding cup এর নলে লাগাইয়া লইবে।

৬টী শিশিতে না রাখিয়া একই পাত্রে ৬ বারের দুগ্ধ রাখিলে প্রত্যেক বার খাওয়াইবার জন্য ঢালিবার সময় তাহা বীজাণু দূষিত হইবার সম্ভাবনা।

কি পরিমাণ গোদুগ্ধে, কত বার্লির জল, কত ক্রিম ও দুগ্ধ শর্করা মিশ্রিত করিতে হইবে তাহা নং ১ তালিকায় প্রদত্ত হইল।

ছাগদুগ্ধ দ্বারা শিশুর কৃত্রিম আহার :—সাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, ছাগদুগ্ধ গোদুগ্ধ অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং ইহাতে এক প্রকার 'বোট্‌কা' গন্ধ আছে। বাস্তবিক পক্ষে এই দুই ধারণারই কোন ভিত্তি নাই। ছাগদুগ্ধে গোদুগ্ধ অপেক্ষা সমস্ত উপাদানই অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে এবং ইহা গোদুগ্ধ অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর; পরিচ্ছন্নতার বিষয় দৃষ্টি রাখিলে ছাগদুগ্ধে কোন প্রকার দুর্গন্ধ অনুভূত

হয় না। শিশুপালন ও রোগীর পথ্যের জন্য ছাগদুগ্ধের ব্যবহার ক্রমশঃই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

গোদুগ্ধের সহিত তুলনাঃ—ছাগদুগ্ধে স্নেহ উপাদান গোদুগ্ধের স্নেহ উপাদান অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্মাকারে বর্ত্তমান আছে; এজন্য কোন পাত্রে অধিকক্ষণ ছাগদুগ্ধ রাখিলেও মাখন ভাসিয়া উঠে না। ছাগদুগ্ধ গোদুগ্ধ অপেক্ষা শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়। প্যারিসের খ্যাতনামা চিকিৎসক Barbellion পরীক্ষা দ্বারা দেখেন যে, পাকাশয়ে পৌছিলে গোদুগ্ধ যেরূপ শক্ত চাপ বাঁধে, ছাগদুগ্ধ সেরূপ চাপ বাঁধে না। যদি সামান্য বাঁধে, তাহা হইলে অল্প আলোড়িত হইলে, ছাগদুগ্ধের চাপ সহজেই দ্রবীভূত হইয়া যায়। নারীদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ পরিপাক হইতে প্রায় একই সময় লাগে; কিন্তু ইহাদের তুলনায় গোদুগ্ধ পরিপাক পাইতে অনেক অধিক সময় লাগিয়া থাকে। ছাগদুগ্ধ, গোদুগ্ধ ও নারীদুগ্ধে কোন উপাদান শতকরা কি পরিমাণে বর্ত্তমান আছে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল ঃ—

			গোদুগ্ধ	নারীদুগ্ধ
আমিষ উপাদান	...	৪·৬৭	৪·৪৭	১·৫০
স্নেহ উপাদান	...	৭·০২	৩·১৪	৩ ৫৬
শর্করা জাতীয় শালি উপাদান	...	৫·২৮	৪·৭৫	৬·৫০
লবণ উপাদান	...	১·০১	০·৬১	০·৪৭
জল	...	৮২·০২	৮৭·০৩	৮৭·৯৭

ছাগদুগ্ধের স্বাদ ও গন্ধঃ—ছাগীর খাদ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর দুগ্ধের স্বাদ ও গন্ধ অনেকটা নির্ভর করে। আমাদের দেশে ছাগীকে পরিষ্কার রাখিবার জন্য বিশেষ কোন যত্ন করা হয় না; এজন্য ছাগদুগ্ধে প্রায়ই 'বোট্‌কা' গন্ধ পাওয়া যায়। দুগ্ধ দোহন সময়ে ছাগীর গাত্র হইতে দুগ্ধপাত্রে ময়লাদি পড়ায় দুগ্ধে দুর্গন্ধ হয়। ছাগীর গাত্র পরিষ্কার রাখিলে এরূপ ময়লা পড়িতে পায় না, দুগ্ধে গন্ধও হয় না।
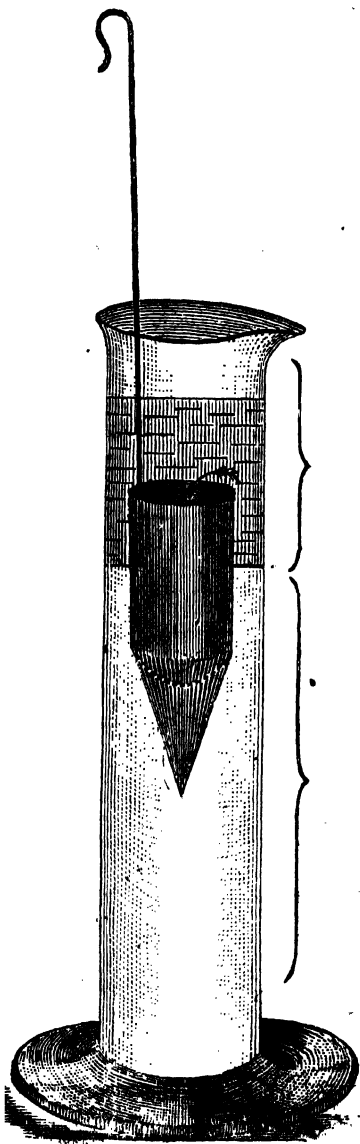
দুগ্ধ হইতে ক্রিম উঠাইবার সহজ উপায়।

কাচের লম্বা পাত্রে দুগ্ধ ৩ ঘণ্টা কাল থাকিলে ক্রিম উপরে থিতাইয়া উঠে।

পলা দ্বারা আস্তে আস্তে তাহাকে তুলিয়া লইতে হয়।

এই ক্রিমে ১৬ ভাগ স্নেহ উপাদান ৩৬ ভাগ আমিষ ও ৪ ভাগ শালি উপাদান থাকে।

সকল প্রকার দুর্গন্ধই দুগ্ধ সহজেই শোষণ করিয়া লয় ; এজন্য দোহন কালে নিকটে যাহাতে পাঁঠা বা অপরিষ্কৃত ছাগী না থাকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যত্নের সহিত ছাগী পালন ও দোহন করিলে দুগ্ধে কোনরূপ দুর্গন্ধ বা বিস্বাদ অনুভূত হয় না।

ছাগদুগ্ধে শিশুপালন :—আমাদের দেশে শিশুর গোদুগ্ধ সহ্য না হইলে তাহাকে ছাগদুগ্ধ দেওয়া হইয়া থাকে। অধুনা পাশ্চাত্য দেশে অনেক চিকিৎসক শিশুকে ছাগদুগ্ধ খাওয়াইবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কোন কোন দেশে শিশুকে ছাগীর স্তনে মুখ দিয়া দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হয়। নিয়মিত সময়ে ছাগী শিশুর নিকট আপনি আসিয়া স্তন্য পান করাইয়া যায়। কত রুগ্ন ও দুর্ব্বল শিশু ছাগদুগ্ধ ব্যবহারে স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছে তাহা বলা যায় না। ছাগদুগ্ধের স্নেহকণাসমূহ অতিশয় ক্ষুদ্র হওয়ায় পরিপাক ক্রিয়া অতি সহজেই সম্পন্ন হয়।

ছাগদুগ্ধে স্নেহ উপাদানের পরিমাণ গোদুগ্ধ অপেক্ষা অনেক অধিক ; এজন্য অল্পবয়স্ক শিশুকে দিতে হইলে ইহাতে জল মিশান কর্ত্তব্য। গোদুগ্ধকে নারীদুগ্ধের সমতুল্য করিতে হইলে তাহাতে কেবল জল মিশাইলে হয় না ; কিছু ক্রিম (cream) ও চিনি ইহার সহিত মিশ্রিত করিতে হয ; নচেৎ স্নেহ উপাদানের পরিমাণ নিতান্ত কমিয়া যায়। ছাগদুগ্ধে স্নেহ উপাদান অধিক থাকায় ইহাতে ক্রিম দিতে হয় না ; কেবল উপযুক্ত পরিমাণে চিনি ও জলে মিশ্রিত করিলেই তাহা নারীদুগ্ধের অনুরূপ হয়। কত বয়সের শিশুকে কতটা জল ও কি পরিমাণে চিনি মিশাইয়া ছাগদুগ্ধ খাওয়াইতে হইবে, পরপৃষ্ঠায় তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

সর্ব্বত্র গোদুগ্ধের অভাব ক্রমশঃ বাড়িতেছে দুগ্ধের দামও বাড়িয়াছে এবং স্থানে স্থানে দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। আমাদের এই গরিব দেশে প্রত্যেক গৃহস্থের ছাগপালন আবশ্যক হইয়াছে। ছাগীরা Poor man's cow। মূল্য অল্প, রাখিবার খরচ নাম মাত্র। গৃহস্থঘরে বালকবালিকারা ছাগ পালন ও দোহন অনায়াসেই করিতে পারে।

ছাগদুগ্ধ দ্বারা ২০ আউন্স শিশুর কৃত্রিম্ আহার প্রস্তুতের তালিকা।

শিশুর বয়স।	ছাগ দুগ্ধের পরিমাণ।	চিনির পরিমাণ	জল মিশাইয়া কত হইবে।	প্রত্যেক বারে কি পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে।	দিনে কতবার খাইতে হইবে।
১ দিন	৪ আউন্স	৫ ড্রাম	২০ আউন্স	$\frac{১}{২}$ আউন্স	৪
২ „	৫ „	৬ „	„ „	$\frac{৩}{৪}$ „	৬
৩ দিন হইতে ১ মাস	৬ „	৭ „	„ „	১ হইতে ১$\frac{১}{২}$ আউন্স	১০
২-৩ মাস	৮ „	৬ „	„ „	২ „ ৪ „	৮
৪-৫-৬ মাস	৮ „	৬ „	„ „	৫ „ ৬ „	৭
৭ দিন হইতে ১২ মাস	১০ „	৬ „	„ „	৭ হইতে ৮ আউন্স	৬

২ আউন্স = ১ ছটাক—এই তালিকাতে ক্রমশঃ দুগ্ধের মাত্রা বাড়িয়াছে ও জলের মাত্রা কমিয়াছে। এইরূপ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনে শিশুর পরিপাক শক্তির ক্রমবিকাশের সুবিধা হইয়াছে।

নবম অধ্যায়।

পেটেণ্ট ফুড ও শিশুর কৃত্রিম আহার।

এই সকল খাদ্য দ্রব্যের রাসায়নিক ও অন্যান্য গুণাগুণ যাঁহারা অবগত আছেন ও বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই ঠিকমত ব্যবহার করিতে পারেন। এই সকল খাদ্য যে বলবর্দ্ধক এবং শিশুদের জন্য অবশ্য আবশ্যক, তাহার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। পেটেণ্ট ফুডে আহার্য্য দ্রব্যের সকল উপাদানই বর্ত্তমান থাকে এবং তাহাদের অধিকাংশই শুষ্ক দুগ্ধ এবং চিনি ও শ্বেতসার ইত্যাদি সহযোগে প্রস্তুত হয়।

অনেক পেটেণ্ট ফুডের বেশ অর্থপূর্ণ নাম আছে; কিন্তু কদাচ তাহা শিশুকে বলবান করিবার জন্য ব্যবহার করিবেন না। বিশেষ কোন প্রয়োজনে অল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করিলে হানি নাই।

এদেশে চলিত কয়েকটী পেটেণ্ট ফুডে কি কি উপাদান বর্ত্তমান আছে পর পৃষ্ঠায় তাহার "*Table*" প্রদত্ত হইল। শিশুদের আহারের জন্য খাদ্য দ্রব্যে যে যে উপাদান থাকা আবশ্যক, তাহা হইতে ইহাদের অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

ইহাদের মধ্যে স্নেহ উপাদান (Fat) খুবই কম। আমিষাংশও পরিমাণে অনেক কম। কিন্তু দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় শালি অংশ (Carbohydrates) অনেক অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে।

লবণের অংশও মনুষ্য ও গোদুগ্ধ হইতে কম।

এই সকল পেটেণ্ট খাদ্যে অদ্রবণীয় শ্বেতসার বর্ত্তমান থাকার জন্য তাহারা শিশুদের আহার্য্য রূপ একেবারেই ব্যবহার যোগ্য নহে। তবে বিশেষ কারণে অতি অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল খাদ্য দ্রব্যে যে সকল আমিষাংশ (Proteins) বর্ত্তমান থাকে,

স্তনদুগ্ধই শিশুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার।

পেটেণ্ট ফুড খাওয়াইলে শিশু দুর্ব্বল অপূর্ণদেহ হইয়া গড়িয়া উঠে; তাহার পেটের অসুখ হয়।

মাতা শিশু প্রসব করিবার পর কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইলে আপন স্তন্য দিতে পারিল না; পেটেণ্ট ফুড খাইয়া শিশু খর্ব্বাকৃতি, দুর্ব্বল, ক্ষীণপ্রাণ হইতে লাগিল।

১৩ই শ্রাবণ

বয়স

চার মাস

ওজন

দুই সের

ডাক্তার বলিলেন, পেটেণ্ট ফুড বন্ধ করিতে হইবে। অবশেষে এক ধাত্রী আপনার স্তন্যদানে ছেলেকে বাঁচাইল।

সেই ছেলে

২ শে পৌষ

ওজন ৭সের

স্তনদুগ্ধ খাইলে { সহজে হজম হয়; জীবাণু থাকিতে পারে না; পেটের অসুখ হয় না; হাড় ও মাংস গড়িয়া ওঠে।

প্রচলিত শিশু খাদ্যের উপাদানের তালিকা।

খাদ্যের নাম	ছানা জাতীয় পদার্থ শতকরা Albuminoids per cent.	স্নেহ শতকরা (Fat per cent.)	শালী জাতীয় পদার্থ (Carbo-hydrates)		লবণ শতকরা	জল শতকরা
			অদ্রবণীয় শ্বেতসার শতকরা	দ্রবণীয় চিনি শতকরা		
শুষ্ক খাদ্যে শরীর রক্ষার উপযোগী উপাদানের পরিমাণ	১২·০	২৬·০		৫২ ০	২·০	৮
এলেন্ বারিস্ ফুড (Allenbury's Food)						
নং ১	৯·৭	২০·০		৬০·৮৫	৩·৭৫	৫·৭
নং ২	৯·২	১৫·০		৬৯·১	৩·৫	৩·৯
নং ৩	৯ ২	১·০		৮২·৮	০·৫	৬·৫
বেন্জার্স্ ফুড (Benger's Food)	১০·২	১·২		৭৯ ৫	০ ৮	৮·৩
হরলিক্স্ মল্টেড মিল্ক Harlick's malted milk	১৩·৮	৯·০		৭০ ৮	২ ৭	৩·৭
মেলিন্স্ ফুড Mellin's Food	৭·৯	০ ১৮		৮২ ৬	৩·৮	৬·৩
মিলো ফুড্ (Milo Food)	১১·০৩	৩·৯২	১৯·০	৬২·	২·১১	১·৫৬
নেসল্স্ ফুড (Neslles Food)	১১·০০	৪ ২৫	৩৭ ১৪	৪০·৯১	১ ৭০	৫·০০
রবিন্সন্স পেটেন্ট বার্লি Robinson's Patent Barley	৫·১৩	০·৯৭	৮৩ ৩৩		১·৯৩	১০·০০
সেভরি এবং মুরস্ ফুড Sovory & Moores Food)	৯·৬৩	০ ৪০	৩৬ ৮০	৪৪·৩	০·৮৯	৮·৩৪

তাহারা প্রায়ই কৃত্রিম উপায়ে পরিপাক প্রাপ্ত (peptonised) অবস্থায় থাকে। পরিপাক প্রাপ্ত অবস্থায় থাকার জন্য শিশুর পরিপাক শক্তির বিকাশের ব্যাঘাত ঘটাইয়া থাকে।

পেটেণ্ট ফুড ব্যবহারের নিম্নলিখিত অসুবিধা দেখা যায়ঃ—

(১) পেটেণ্ট ফুডে যে বরাবরই একই উপাদান সকল বর্ত্তমান থাকিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে তাহার প্রস্তুতকারকের সততার উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন নিশ্চয়তা নাই।

(২) ফুড যে কত দিনের তৈয়ারি তাহাও জানিবার কোনও উপায় নাই।

(৩) এই সকল পেটেণ্ট ফুডের পুষ্টিকারিতার অনুপাতে দাম অনেক অধিক লাগে।

(৪) এই সকল পেটেণ্ট ফুড-ভোজী শিশুদের মধ্যে স্কার্ভী রোগ হইতে দেখা যায়।

(৫) ব্যবস্থা মত তৈয়ারি করিলেও, অধিকাংশই শিশুর পুষ্টিসাধনে সক্ষম হয় না। যেহেতু

(ক) ইহাতে স্নেহাংশ অনেক কম।

(খ) শালী-জাতীয় উপাদান অনেক অধিক পরিমাণে থাকে।

(গ) আমিষাংশ পরিপাক প্রাপ্ত অবস্থায় থাকে বলিয়া পরিপাক-শক্তির ক্রমবিকাশের বিশেষ অসুবিধা করিয়া দেয়।

গোদুগ্ধ ও ছাগীদুগ্ধ দ্বারা শিশুর কৃত্রিম আহারের ব্যবস্থার অসুবিধা হইলে এই সকল পেটেণ্ট ফুড অল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করিতে দেওয়া যাইতে পারে। ইহাদের দ্বারা শিশুর আহারের একঘেয়ে রকম অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হয়। এই সকল পেটেণ্ট খাদ্য দুগ্ধ-শর্করার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা হইতে পারে। চিকিৎসকেরা কোন পেটেণ্ট ফুড ব্যবস্থা দিবার পূর্ব্বে তাহাতে কোন উপাদান কত বর্ত্তমান আছে তাহা যেন

উত্তমরূপে জানিয়া রাখেন। পেটেণ্ট ফুড ব্যবহার কালে শিশুকে ফলের রস বা তরকারি সিদ্ধ জল অল্প অল্প খাইতে দিলে তাহাদিগকে স্কার্ভী বা রিকেট্স্ রোগ আক্রমণ করে না।

অনেকেই আমাদিগকে প্রশ্ন করিয়াছেন,—খাঁটি গোদুগ্ধ শিশুর আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কি না এবং যদি খাঁটি দুগ্ধ ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে কি অসুবিধা হইতে পারে?

Franceএ খাঁটি দুগ্ধ অনেক শিশু-হাসপাতালে শিশুদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এবং তথাকার অধ্যক্ষেরা ইহা সন্তোষজনক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশেও অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা শিশুকে খাঁটি গোদুগ্ধ খাইতে দেন।

খাঁটি গোদুগ্ধ শিশুর পাকস্থলীতে শক্ত বড় বড় জমাট বাঁধিয়া অনেক সময় শিশুর প্রাণ সংশয় করে এবং কখনও কখনও শিশুও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেজন্য এইরূপ হঠকরিতা করা কোন মতে উচিত নহে।

Citrate of Soda নামক লবণ খাঁটি গোদুগ্ধে মিশাইলে তাহা বড় বড় চাপ বাঁধে না। ১ আউন্স খাঁটি গোদুগ্ধে দুই গ্রেন Citrate of Soda মিশাইলে তাহা আর বড় বড় চাপ বাঁধে না।

এইরূপে Citrate of Soda মিশান খাঁটি গোদুগ্ধ খাওয়াইবার এই সুবিধাগুলি দেখা যায়:—

(১) ইহা অতি সহজ উপায়।

(২) মাপে অনেক কম খাইতে হয় বলিয়া শিশুর পাকস্থলীর বেশী বিস্তার হয় না (Dilatation of Stomach)।

(৩) খাঁটি দুগ্ধ বেশ মুখরুচিকর হয় এবং ইহা খাইয়া শিশু বেশ তৃপ্ত হয়।

ইহার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদত্ত হইল:—

(১) খাঁটি গোদুগ্ধ গোবৎসের পরিপাক শক্তির ক্রমবিকাশ জন্য এবং

তাহার বৃদ্ধির জন্যই বিশেষরূপে উপযুক্ত; মনুষ্য শিশুর জন্য নহে। যদিও অনেকে ইহা সন্তোষজনক বলেন, কিন্তু ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে।

(২) খাঁটি দুগ্ধ ব্যবহারে পরিপাক ক্রিয়া ক্রমশঃ অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায় এবং পরে শিশু পেটুক হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ তাহার অজীর্ণতার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

(৩) Citrate of Soda দীর্ঘকাল ব্যবহারে কোষ্ঠবদ্ধতা আনয়ন করে।

(৪) এক উপাদানের দুগ্ধ বরাবর খাইতে দিলে, বর্দ্ধনশীল শিশুর ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনীয়তার প্রতিবন্ধক করে।

দশম অধ্যায়।

ছেলেদের খেলা।

বাঙ্গালীর বাড়ীতে ছোট ছেলেদের জন্য একটা কোন বিশেষ ঘর নাই। শুইবার ঘর, বৈঠকখানা, খাইবার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, ঠাকুর ঘর ইত্যাদি বাড়ীর সকল ঘরের একটা নাম আছে; কিন্তু ছোট ছেলেদের থাকিবার বা খেলিবার ঘর বলিয়া কোন ঘর নাই। সাহেবদের যেমন ড্রয়িং রুম্ (বসিবার ঘর), ডিনার রুম্ (খাইবার ঘর) ইত্যাদি নানা ঘর আছে; সেইরূপ বাড়ীতে নারসারী (Nursery) বা ছোট ছেলেদের একটা বিশেষ ঘর আছে। বাড়ীর ছোট ছেলেরা সেই ঘরটার রাজা, সেই ঘরটিতে তাহারা শোওয়া, বসা, পড়া, খেলা, লাফালাফি, চেঁচামেঁচি অবাধে করিতে পারে। ছোট শিশু যখন পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, তখন সে এক বিশেষ ঘরের দাবী লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহার অভ্যর্থনার জন্য শুধু ত' মঙ্গলশঙ্খ বাজাইলে হইবে না; তাহার জন্য বাড়ীর যে ঘরটি সবচেয়ে ভালো তাহা রাখিতে হইবে। সেই ঘরই যথার্থ ঠাকুর ঘর। সাহেবদের ছেলেমেয়েরা জন্মগ্রহণের পর হইতে নারসারীতে প্রবেশ করে। সেই ঘরে তাহারা মায়ের প্রেমে, ধাত্রীর যত্নে, পরিচারিকাদের সেবায় ধীরে ধীরে কুঁড়ি হইতে ফুলের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। এই নারসারীর মধুময় অপরূপ স্মৃতি তাহাদের মনের সহিত সারাজীবন জড়িত থাকে।

গরীব বাঙ্গালীর একান্নবর্ত্তী পরিবারে ঘরের খুবই অকুলান। খুব কম বাঙ্গালীরই বৃহৎ প্রাসাদ আছে। তবু, যতদূর সম্ভব, ছেলেদের এক বিশেষ ঘর বা বিশেষ স্থান প্রতি পরিবারে থাকা দরকার। বাঙ্গালীর বাড়ীতে এক ঘরেই নানা ঘরের কাজ সারিতে হয়। মায়ের শোবার ঘরেই শিশুরা ঘুমায়। ছেলে যত দিন না বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তত দিন মায়ের ঘরই

তাহার শুইবার ঘর। এ প্রথা ভালই। কিন্তু ছোট ছেলেদের খেলিবার জন্য একটি বিশেষ ঘর বা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকা দরকার। এরূপ না থাকিলে যে মুস্কিল হয়, তাহা বাঙ্গালীর পরিবারে প্রায়ই দেখা যায়। ছোট ছেলে পিতার কাজের ঘরে গোলমাল করে, বই ছেঁড়ে, টেবিল চেয়ার নাড়ে,—মাতার রান্নাঘরে গিয়া কান্না জোড়ে, তরকারী মসলা লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়,—আর ফলে, তার ভাগ্যে বকুনি বা প্রহার জোটে। পিতা তাহাকে পীড়ন করেন, মাতা তাহাকে শাসন করেন,—শিশু-প্রাণের খেলার আনন্দ কেহই বোঝেন না।

বাঙ্গালীর মায়েরা চান শান্ত ধীর ছেলে;—যে ছেলে চেঁচায় না, লাফায় না, দৌড়াদৌড়ি গোলমাল করে না, সেই ছেলেই সবচেয়ে ভালো। বাঙ্গালী পিতারা চান পণ্ডিত ছেলে;—যে ছেলে বইয়ে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে, খেলায় বা বাহিরের আমোদে বিশেষ মন নাই, সেই হচ্ছে তাঁহাদের আদর্শ পুত্র। কিন্তু সাহেব পিতামাতারা চান অশান্ত দুরন্ত প্রাণবান পুত্র। কেন না, তাঁহাদের শিশুরা বড় হইলে দেশে ও বিদেশে সাম্রাজ্য রক্ষা করিবে, জলে স্থলে শূন্যে আধিপত্য করিবে; তাহারা সাগর ডিঙাইবে, শূন্যে উঠিবে, নব নব নগর গড়িবে, মানবসভ্যতার অগ্রণী হইবে। চাই বলবান শক্তিমান পুত্র। তাই সাহেব ছেলেমেয়েদের খেলাটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। লর্ড ওয়েলিংটন বলিয়াছেন, "আমি ওয়াটারলু যুদ্ধ ঈটনের ক্রীড়াক্ষেত্রেই জয় করিয়াছিলাম।" শুধু বই পড়ায় নয়,—নানারূপ খেলার মধ্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব গড়িয়া উঠে। আজকাল ইয়োরোপের নানাস্থানে খেলার মধ্য দিয়া শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার পদ্ধতি (Kinder-garten System) গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে ছোট ছেলেদের পক্ষে লেখাপড়া শুধু যে একটা ভার, একটা বিষম বোঝা তা নয়,—তাহাতে ছেলেদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহাদের দেহের ও মনের পূর্ণ বিকাশ হয় না।

ছোট ছেলেদের জীবনে খেলার একটি বিশেষ স্থান আছে। খেলার উপকারিতা খুবই বেশী। শিশু-স্বাস্থ্যবিৎ পণ্ডিত F. Froebel বলেন,

"Play is the highest phase of child-development. The plays of childhood are the germinal leaves of all later life ; for the whole man is developed and shown in these Come, let us live with our children."

গতি, চাঞ্চল্য হচ্ছে প্রাণের লক্ষণ। যাহা অনড়, অসাড়, স্থির, তাহা ত মৃত। শিশু-জীবনের পক্ষে চাঞ্চল্য অস্থিরতা দরকার। নানাপ্রকার খেলার মধ্য দিয়াই ছেলেরা আপনার প্রাণশক্তিকে বিকশিত করে; খেলার উৎস দিয়াই তাহাদের আনন্দরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। বয়স্ক ব্যক্তিরা নানাপ্রকার দৈহিক ও মানসিক শ্রম দ্বারা আপনার প্রাণশক্তিকে প্রকাশিত করেন; শিশুরা নানা খেলার মধ্য দিয়াই তাহার পরিচয় দেয়। ছেলেরা লাফাইবে, দৌড়াইবে, নাচিবে, হাসিবে, চেঁচাইবে, ছুটোছুটী করিবে—এই ত শিশু-জীবনের লীলা। যে মাতাপিতা ছেলেকে কেবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে, স্থির ধীর করিতে চান,—তাঁরা জীবন-উৎসকে পাথর চাপা দিয়া বন্ধ করেন।

ছেলেদের বয়স অনুসারে তাহাদের খেলার প্রকৃতিও আলাদা হয়। জন্মগ্রহণের পর হইতে শিশু যেমন বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়া ওঠে, সেইরূপ তাহার খেলার রূপও বদলাইয়া যাওয়া দরকার।

শিশু জন্মিয়াই কাঁদিয়া ওঠে,—সেই ক্রন্দনই সদ্যোজাত জীবনের প্রথম ধ্বনি। জীবনের প্রথম বৎসর সে আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়াই খেলে; শুইয়া শুইয়া হাত পা ছোঁড়া, চোখ খোলা, চোখ বোজা, জিনিষ ধরিতে হাত বাড়ান,—এইরূপ আপনার হাত পা নাড়ার আনন্দেই সে বিভোর থাকে। জীবনের দ্বিতীয় বৎসরে নূতন জগৎকে জানিবার ঔৎসুক্যে তাহার অন্তর ভরিয়া থাকে; সে চারিদিক বিস্মিত নেত্রে দেখে, রঙীন

জিনিষ দেখিলে ধরিবার জন্য হাত বাড়ায় ; হামাগুড়ি দেয়, চলিতে চেষ্টা করে, জগতের নানা শব্দের তরঙ্গ তাহার কাণে আসিয়া পৌঁছায়, সে আধ আধ স্বরে সেই শব্দ আপনার মুখে ফুটাইতে চেষ্টা করে। যাহা পায় তাহাই ধরে, তাহাই নাড়ে ; রঙীন জিনিষ দেখিলে ছুটিয়া ধরিতে যায়, হাতে পাইলে খুব খুসি হয় ; নূতন জগৎকে সে জানিতে বুঝিতে ধরিতে খুঁজিতে চায় ; ঘরময় হামাগুড়ি দেয়, অস্ফুট ভাষায় কত ধ্বনিরই অনুকরণ করে।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু কিরূপে খেলিতে পারে তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

(প্রথম ছয় মাস)

জিনিষ ধরা	শব্দ শোনা
জিনিষ মুখে পোরা	হাত পা ছোঁড়া
তাকাইয়া দেখা	চেঁচান
রঙীন জিনিস উৎসুক হইয়া দেখা	হাসা

খেলার উপকরণ—ছোট ছোট খেল্না, রঙীন পুঁতুল

(ছয় মাস হইতে এক বৎসর)

জিনিষ টানা	গান বা শব্দ শোনা
জিনিষ নাড়া	হামাগুড়ি দেওয়া
শব্দ করা	হাত ধরিয়া দাঁড়ান বা চলা

এই বয়সে শিশুর দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে,—শিশুরা জিনিষ কামড়াইতে চায়। তখন তাহাদের মুখে চুষিকাটি দেওয়া ভাল,—তাহাতে দাঁত শীঘ্র শীঘ্র উঠে।

খেলার উপকরণ—চেয়ার, রেলিং, ঝুমঝুমি, চুষিকাটি।

(এক হইতে দুই বৎসর)

ধরিবার, দেখিবার, শক্তি বাড়িয়া যায়,
ঘরময় ঘুরিয়া বেড়ায়,
দরজা খুলিতে বা বন্ধ করিতে পারে,
দরজার আড়ালে লুকাইতে পারে,
জিনিষ লইয়া শব্দ করিতে, কাগচ ছিঁড়িতে পারে,
গোলা গড়াইয়া দিতে বা ধরিতে পারে,
ছোট পুঁতুল বা ছোট কাঠের ছোট জন্তু, পাখী,
গাড়ী ইত্যাদি লইয়া খেলিতে পারে,

খেলার উপকরণ ঃ—দোলনা, ছোট সিঁড়ি, তাহা ধরিয়া উঠিতে পারে;

(দুই হইতে চার বৎসর)

জিনিষ বুঝিবার, অনুকরণ করিবার শক্তি বর্দ্ধিত হয়। ছোট ঘর ছাড়িয়া বাড়ীর চারিদিকে ঘূরিতে চায়।

বাড়ীর কোন ঘরে কি আছে জানিতে চায়।

মাটি কাদা, বালি লইয়া খেলিতে পারে;

ছোট পাহাড় গড়া, পাহাড়ের মাথায় পুকুর, পাহাড়ের গায়ে নদী, তাহার উপর সেতু, ইত্যাদি নানা খেলা।

বল ধরা, বল ছোঁড়া, বল লইয়া ছোটা।

পাথর কুড়ানো, নতুন বা আশ্চর্য্যকর জিনিষ সংগ্রহ করা, উঁচু জায়গায় চড়া, দড়ি ধরিয়া লাফান বা দোলা।

মাতাপিতার কাজের অনুকরণ করা, যেমন পুতুল খেলা, কলম লইয়া হিজিবিজি কাটা, ইত্যাদি।

নানা প্রকার খেলনা লইয়া খেলা,—নানাপ্রকার জীব জন্তু পাখী; রঙীন কাগজের খেলনা।

খেলার উপকরণ।

দড়ি, ঘরে বা মাঠে ঝুলাইয়া দিলে, তাহা লইয়া ছেলেরা দুলিতে পারিবে।

খড়, বালি, ইত্যাদি, তাহা লইয়া পাহাড় করিতে, গহ্বর করিতে পারিবে।

জলের খেলার জন্য লোহার নল, টব, ইত্যাদি চাই।

(চার হইতে ছয় বৎসর)

ছোট ছেলেরা এক কল্পলোকে বাস করে। ছেলেদের কল্পনা শক্তি অতি অদ্ভুত, অতি বিচিত্র, অতি আশ্চর্য্যকর। কল্পনার রঙীন আলো দিয়া তাহারা সাধারণ জনকে অপরূপ করিয়া তোলে। চেয়ার বা বেঞ্চ তাহাদের রেলগাড়ী হয়, এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহারা এক ষ্টেসন হইতে আর এক ষ্টেসনে পৌছায়। দ্বারের নীচু স্থান জল ও উঁচু স্থান স্থল, এরূপ বিভাগ করিয়া লইতে তাহাদের কিছু দেরী হয় না। ঘরের এক কোণকে তাহারা কলিকাতা আর এক কোণকে কাশী করিতে পারে। 'আমি রাজা,' 'তুমি মন্ত্রী', 'ও আসামী' আর 'এই টুলটা সিংহাসন' এরূপ ভাবিয়া লইতে তাহাদের কিছুই কষ্ট হয় না। এই কল্পনাশক্তির সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ শক্তিও খুব বাড়িয়া উঠে। 'রেল-গাড়ী' খেলা, পুতুলের বিয়ে দেওয়া' ইত্যাদি নানা খেলায় তাহারা মাতিয়া থাকে।

ভাল করিয়া লাফাইতে, দৌড়াইতে পারে; দল বাঁধিয়া যাইতে, সাঁতার কাটিতে, নাচিতে সুরু করে।

ছবি আঁকিতে, ছবিতে রঙ্ দিতে, কাট কাটিতে, শিক্ষা পাইলে ছুতারের কাজ সামান্যরূপে করিতে পারে।

জিনিষ মাপিতে, জিনিষ ওজন করিতে পারে। বাগানে জল দিতে, গাছ পুঁতিতে, ছোট কুকুর বা বেড়াল লইয়া খেলা করিতে পারে, তাহাকে যত্ন করিতে পারে।

তাহার চোখে যাহা আশ্চর্য্য বা অদ্ভুত লাগে, যেমন ছোট রংওয়ালা পাথর, গাছের নানারকম পাতা, ছোট কীট, ছবি, নিশান, রঙ্গীন কাগজ, ফুল, ইত্যাদি জমাইতে পারে। জিনিষ দেখিয়া তাহা কিরূপে হইল, কেন হইল, 'এটা কি,' 'ওটা কি', ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করে, তাহার সম্বন্ধে ভাবে, ও নিজের মন-গড়া সিদ্ধান্ত করে। গান গাহিতে, বাজাইতে সুরু করে। বাড়ীর ভিতর ও চারিদিকের পথ কোথায় কিরূপ, তাহা দেখিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

এই বয়সে ছেলেরা ঘর ছাড়িয়া বাহির হয়; বাড়ীর উঠানে বা বাগানে তাহাদের খেলার জায়গা ঠিক করিয়া দেওয়া দরকার। তাহাদের কাপড় জামার দিকেও এই সময়ে দৃষ্টি রাখা দরকার। খুব আঁট জামা হইলে খেলিতে অসুবিধা হয়। সাদাসিধে পোষাকই ভাল। অনেক মাতা বিকেলে তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের খুব ভাল পোষাকে সাজাইয়া ঝি চাকরের সঙ্গে বেড়াইতে পাঠান; ছেলেমেয়েরা জামা-কাপড়ের দোকানে সাজানো পুতুলের মত স্থির ধীর হইয়া বেড়াইতে যায়; তাহারা নড়িতে দৌড়াইতে ভয় পায়; পাছে কাপড় ছেঁড়ে, জামা ময়লা হয়। ছেলে-মেয়েদের দেহটা যে কাপড় জামার দোকান নয়, এটা মাতারা ভুলিয়া যান। বেশভূষা স্বাস্থ্যের জন্য। ছেলেমেয়েদের সুন্দররূপে সাজাইয়া মাতার সৌন্দর্য্যবোধের তৃপ্তি হইতে পারে; কিন্তু ছেলেমেয়েদের মনে কোন শান্তি থাকে না,—জামা ময়লা হইলে যে মার খাইতে হইবে এই ভয় তাহাদের মনে সর্ব্বসময়েই জাগ্রত থাকে। যাহাতে ছোট ছেলেরা দৌড়াইতে, লাফাইতে, ছুটোছুটি করিতে পারে এরূপ কাপড় জামা পরানো দরকার। তাহারা ধীরে ধীরে আপনার কাপড় জামার যত্নও শিখিবে কাপড় জামা না ছিঁড়িয়াই খেলিতে শিখিবে।

এই সময়টায় ছেলেদের মন খুবই চঞ্চল থাকে। একটা খেলা হইতে না হইতেই আর একটা নতুন খেলা আরম্ভ করিয়া দেয়। কখন যে কি

করিবে তাহার ঠিক পায় না—মন ছটফট করিয়া বেড়ায়,—একবার এটা করে, আবার ওটা করে—কিছুতেই মন দিতে পারে না—কোন বিশেষ খেলা করিয়াই মনে তৃপ্তি লাভ করে না। এই সময়ে খেলার একজন বয়স্ক সঙ্গী থাকিলে খুবই ভালো। তিনি সব খেলায় যোগ দিয়া তাহার মন স্থির রাখিতে পারেন, কোন খেলার পর কোন খেলা করা যাইতে পারে, তাহা ঠিক করিয়া দিতে পারেন।

এই বয়সে কোন ছেলে বা মেয়েকে একা রাখা উচিত নয়; একা থাকিলে সে কুনো, গম্ভীর, স্বার্থপর হইয়া উঠে। পাঁচ ছয়জন ছেলেমেয়ে একসঙ্গে খেলিলে, তাহারা পরস্পরকে ভালবাসিতে শেখে, পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারে;—আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া পরের ভাল করিতে, আপনার স্বার্থ দূরে রাখিয়া যাহাতে সকলের মঙ্গল হয় এরূপ করিতে পারে। এইরূপেই বিশ্বপ্রেম, বিশ্বমৈত্রীর জন্ম হয়। দেশহিতৈষী, সমাজ-সেবী হইতে হইলে যে সকল গুণের দরকার, তাহা একা একা থাকিলে ফোটে না; দশজন মিলিয়া খেলার মাঝেই তাহা ফুটিয়া ওঠে।

ছয় হইতে দশ বৎসর

এই বয়সে ছেলেরা কোন নিয়ম মানিয়া খেলিতে পারে। 'লুকোচুরির' মতন খেলার নিয়ম সহজ; কিন্তু ফুটবল্ খেলার নিয়ম জটিল। ৮।১০ বছর বয়স না হইলে এরূপ জটিল খেলা ছেলেরা বোঝে না।

যে সব খেলায় দৌড়াদৌড়ি করিতে হয় সেই সব খেলাই বেশী করিয়া খেলা দরকার। হাড়ুডুডু বা কপাটি খেলা, বল খেলা মন্দ নয়। তবে খুব বেশী দৌড়াদৌড়ি করা উচিত নয়। অতিরিক্ত শ্রম স্বাস্থ্যের অপকারই করে। গাছে চড়া, সাঁতার কাটা, দোলা, ডিগবাজী খাওয়া, লাফান ইত্যাদি নানাপ্রকার খেলায় দেহের ব্যায়াম হয়।

ছয় বছর হইতে ছেলেরা প্রায়ই লেখাপড়া আরম্ভ করে; নানাপ্রকার

খেলার মধ্য দিয়াই তাহাদের শিক্ষা যাহাতে সুগম ও সহজ হইয়া উঠে, তাহার চেষ্টা করা দরকার। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি যত অবলম্বন করা যায় ততই ভাল।

কলের ছোট রেলগাড়ী, ষ্টীমার চালান, তাহাদের কলকারখানা যেমন ছোট রেলগাড়ী, নৌকা, বাড়ী তৈয়ারী করা—এইরূপ খেলায় ছেলেরা খুব আমোদ পায়, তাহাদের মনে কলকারখানার কাজ শিখিবার ইচ্ছা জন্মে।

ছেলেরা ছুতরের কাজও সামান্যরূপে করিতে পারে। ছোট ছোট কুড়াল বাটালী দিয়া কাট চেরা, প্লেন করা, নিজেদের খেলার জন্য টুল, বেঞ্চি তৈরী করা, এ বেশ আনন্দের খেলা।

দোকানদার খেলাও বেশ আনন্দজনক; কয়েকজন মিলিয়া ঘুড়ি, লাট্টু, মার্ব্বেল বা পেন্সিলের দোকান খুলিবে, কেউ হিসাব রাখিবে, কেউ বিক্রেতা হইবে; অপর ছেলেরা ক্রেতা হইবে। ইহাতে পাঁচজন মিলিয়া কাজ করিবার সহজ ক্ষমতা জন্মে।

ছবি আঁকা, ঘর সাজানো, গান গাওয়া গল্প শুনিয়া বা পড়িয়া তাহা অপর সঙ্গীদের বলা; মজার মজার জিনিষ সংগ্রহ করা, যেমন ভালো ছবি, নানাদেশের টিকিট (ষ্ট্যাম্প) নানারকম পাথর, কীট, পতঙ্গ, ইত্যাদি—নানাপ্রকার খেলা আছে। একদল ছেলে মিলিয়া মাঝে মাঝে গীতিনাট্য বা হাস্যকর সহজ নাট্য অভিনয় করিতে পারে। এক বাড়ীর ছেলেরা পাশের বাড়ীর বা কোন আত্মীয়ের বাড়ীর ছেলেদের নিমন্ত্রণ করিয়াই মাঝে মাঝে খাওয়াইতে পারে। তাহাদের উপর জিনিষপত্র আনিবার, ভালরূপে অভ্যর্থনা করিবার, পরিবেষণ করিবার ভার দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য এসব খেলা ছেলেরা একা করিতে পারে না, মাতাপিতার বা বয়স্ক ভাই ভগ্নীদের বা শিক্ষক, বন্ধুদের সাহায্য খুবই দরকার। বয়স্ক ব্যক্তিরা ছেলেদের

এই সব খেলায় যোগ দিয়া যে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিবেন এমন আর কোথায় পাইবেন ?

ছেলেদের মাঝে মাঝে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া দরকার। শুধু পশুশালা বা মিউজিয়ামে লইয়া গেলেই হইল না ; তাহাদিগকে পাহাড়ে, নদীর ধারে, খোলা মাঠের মাঝে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া দরকার। মাঠে বা বনে তাহাদিগের উপর চোখ রাখিয়া তাহাদিগকে অবাধে ঘুরিতে দেওয়া দরকার। তাহাদের চোখে যাহা ভাল লাগিবে, সেই সব জিনিষ তাহারা জমাইবে। এইরূপে প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ ও প্রকৃতিকে ভালবাসিবার শক্তি জন্মে।

ছেলেরা ৮।১০ বছরের হইলে, তাহাদের জন্য বিশেষ খেলিবার ঘরের আবশ্যক হয় না ; কারণ তাহাদের খেলার স্থান বাড়ীর উঠান, বা মাঠ, খোলা জায়গা। কিন্তু তাহাদের জন্য এক বিশেষ ঘর চাই ; সেই ঘরে তাহারা ছোট মিউজিয়াম করিতে পারে, বা খেলার দোকান করিতে পারে ; সেই ঘরে তাহাদের ছুতোর খেলা, ইঞ্জিনিয়ার খেলা, বা ছবি আঁকা, গান শেখা ইত্যাদি নির্ব্বিবাদে চলিতে পারে। এই খেলার মধ্য দিয়া কোন্ ছেলের কি প্রকৃতি তাহা সহজে ধরা যায় ; কার শক্তি কোন্ মুখে, কে কোন কাজে পারদর্শী হইবে তাহা বোঝা যায় ; এইরূপে ছেলেদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি বুঝিতে পারিলে, তাহাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা ঠিক করা যায়।

নানাপ্রকার খেলার মধ্য দিয়া দেহ ও মনের কি কি শক্তি ফুটিয়া ওঠে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল—

মানসিক শক্তি ঃ—	নৈতিক গুণ ঃ—
পর্য্যবেক্ষণ	অধ্যবসায়
মনোযোগ	শিষ্টাচার
কর্ম্মতৎপরতা	সাহস

অনুকরণশক্তি	ধৈর্য্য
বোধশক্তি	স্বাধীনতা
কল্পনাশক্তি	ন্যায়প্রিয়তা
বিচারশক্তি	ঔদার্য্য
উদ্ভাবনশক্তি	সাহচর্য্য
নেতৃত্ব	
ব্যক্তিত্ব	
কৌতুকপ্রিয়তা	

নানাপ্রকার খেলার মধ্য দিয়াই ছেলেরা এই রূপরসগন্ধশব্দময় বিচিত্র আনন্দকর জগৎকে ভাল করিয়া দেখিতে, বুঝিতে, ধরিতে, খুঁজিতে পারে। তাহাদের সৌন্দর্য্যবোধ জন্মে। আপন দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে যেরূপ ইচ্ছা ঘুরাইতে পারে ; মাংসপেশীগুলি, যেরূপ দরকার, নাড়িতে চালাইতে পারে ; তাহারা কর্ম্মতৎপর, সজীব, সজাগ, স্বাস্থ্যবান হয়।

ছোট ছেলেদের মনোজগৎ যে বয়স্ক ব্যক্তিদিগের মনোজগৎ নয়, তাহা মাতাপিতা, শিক্ষকগণ ভুলিয়া যান ; শিশুদের একটি বিশেষ জগৎ আছে। ছোট ছেলেরা এক কল্পলোকে, অপরূপ রাজ্যে বাস করে ; তাহাদের দেহ ও মন উন্মুখ কুঁড়ি মাত্র, প্রস্ফুটিত ফুল নয়। মাতাপিতারা মনে করেন, ছেলেমেয়েদের যাহা বলিতেছি তাহাই তাহারা বুঝিতেছে,—যাহা বারণ করিয়া দিয়াছিলাম তাহাই তাহারা মনে করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। এইরূপ ছোট ছেলেমেয়েদের বোধশক্তি, বিচারশক্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের নানা ভুল ধারণা আছে। ছেলেরা নবীন, সতেজ, সচল ; তাহারা কিছু বোঝে না, কিছু জানে না,—তাহারা শুধু খেলিতে চায়। মাতাপিতাকে এই স্বার্থপর বুদ্ধিমানের জগৎ হইতে ছেলেদের আনন্দময় নবীন জগতে আসিয়া তাহাদের খেলায় যোগ দিতে হইবে। ছোট ছেলেমেয়েদের অন্তরেও সুখ দুঃখ হাসি

কান্না আশা নিরাশার খেলা চলিতেছে। তাহাদের মনেও ক্ষুধা, বাসনা, তৃষ্ণা রহিয়াছে। তাহাদের জীবন শরৎ-আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের খেলার মত ক্ষণিক কান্না ও হাসিতে ভরা। কান্নাই ছেলেদের ব্যথার ভাষা। যখন দেহে ও মনে কোথাও ব্যথা অনুভব করিতেছে, কিছু চায় অথচ পাইতেছে না, যাহা ভালবাসে তাহা হারাইতেছে, তখন শিশু কাঁদে। কান্নাই তাহার সকল চাওয়া, সকল ব্যথা, সকল ক্ষুধার,—তাহার ক্রোধ, অভিমান, লজ্জার কথা বলে। ছেলেরা যখন কাঁদে, মাতারা তাহাকে ধমক দেন। তাঁহারা দেখেন না, কেন সে কাঁদিতেছে। তাহাকে খাইতে দিয়া ভোলান, বা মেজাজ গরম থাকিলে গালে চড় বসাইয়া দেন। শিশুরা সব সময় খাইবার জন্যই কাঁদে না। হয় ত পেটে ব্যথা হইতেছে, বা জামা পরিয়া গরম হইতেছে, বা রঙীন খেলা দেখিয়া পাইতে লোভ হইয়াছে—এইরূপ নানা কারণ আছে। যে মাতা আপন বুদ্ধির জগৎ ছাড়িয়া ছেলেদের জগতে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়া প্রবেশ করিবেন, তিনিই সেই কান্নার কারণ জানিতে পারিবেন।

"Suffer the little children to play."

ছেলেদের খেলিতে দাও। মাতাপিতারা যদি সে খেলায় যোগ দিতে পারেন, ভালই; যদি না পারেন, তবে ছেলেদের শান্তশিষ্ট, প্রাণহীন করিবার দুঃসাধ্য ব্রত যেন গ্রহণ না করেন। প্রাণ চঞ্চল, গতিবান, লীলা-ময় লইবেই; খেলাই ছেলেদের ধর্ম্ম। প্রাণের লক্ষণই আপনাকে বিকাশ করা, প্রকাশ করা, নানারূপে উৎসারিত করিয়া দেওয়া।

একাদশ অধ্যায়।

শিশুর ব্যায়াম বা শরীর-চালনা।

শরীর, মন বা আত্মা,—সম্যক্ চালনা না করিলে কাহারও উন্নতি হয় না। শরীরের বল, বুদ্ধি বা স্মরণ শক্তির প্রাখর্য্য, আধ্যাত্মিক উন্নতি—সকলি চালনা-সাপেক্ষ। যে ব্যক্তি চিরকাল অন্ধকারময় স্থানে বাস করে, সূর্য্যালোক যে কখন দেখিতে পায় না, সে চালনার অভাবে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হয়। অথবা যে ব্যক্তি লোকশূন্য বিজন গহনে জন্মাবধি যাপন করে, মনুষ্যের ভাষা যে কখনও শুনিতে পায় নাই, সে বাক্শক্তি বিরহিত হইয়া থাকে—চালনার এতই মাহাত্ম্য। যে ব্যক্তি কখনও দয়া দাক্ষিণ্যের চালনা করে নাই, কখনও ধর্ম্মচর্চ্চা করে নাই, সে কি প্রকারে দয়াবান্ বা ধার্ম্মিক হইবে? এই মনুষ্যের মধ্যে অসীম অনন্ত শক্তি বিরাজ করিতেছে, মনুষ্যের মধ্যে যে কত শক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে, মনুষ্য নিজেই তাহার পরিমাণ করিতে পারে না; পরন্তু শিক্ষা বা চালনা বলে সেই সকল শক্তির উদ্দীপনা হইয়া থাকে।

চালনার আবশ্যকতা।

প্রকৃতির নিয়ম এই যে, সংসারে বিনা কর্ম্মে বা বিনা দেহেন্দ্রিয়মনের চালনায় কেহই নিষ্কর্ম্মা হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। সকলকেই বাধ্য হইয়া কোন না কোন কর্ম্ম করিতে হয়। যে মনে করিতেছে যে আমি নিষ্কর্ম্মা হইয়া আছি, সেও হয় তো মনে মনে কোন সঙ্কল্প বিকল্প করিতেছে। জীবিতাবস্থায় কেহ একেবারে ক্রিয়াশূন্য হইতে পারে না, —ক্রিয়াশূন্য অবস্থাকেই আমরা মৃত্যু বলি। কাজ বা চালনা সকলকেই করিতে হয়। কিন্তু সেই কাজ বা চালনা, যাহাতে দেহ মন আত্মা তিনেরই সামঞ্জস্য, স্ফূর্ত্তি বা বিকাশের কারণ হয়, তাহাই প্রকৃত চালনা,

শরীর মন ও আত্মার সামঞ্জস্য; চালনাই প্রকৃত শিক্ষা।

কাজ বা শিক্ষা। মন বা আত্মা নিষ্ক্রিয় রাখিয়া কেবল দেহচর্চ্চা করাও ঠিক্ নয়; অথবা কেবল আত্মা বা মনের চর্চ্চা করিলাম, দেহের পানে একবারও তাকাইলাম না—তাহাও ঠিক নয়। এই তিনেরই সমভাবে উন্নতি করাই প্রকৃত শিক্ষার উন্নতি। এই তিন লইয়াই মনুষ্য, মনুষ্যের উন্নতি বলিলে এই তিনেরই উন্নতি বুঝায়। ইহার কোনটার অযোগ, অতিযোগ বা মিথ্যাযোগ ঘটিলে তিনটারই অযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যা-যোগ ঘটে। এই তিনের সমযোগের নাম প্রকৃত স্বাস্থ্য এবং এই তিনের সামঞ্জস্যই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

শারীরিক বল বা স্বাস্থ্যই সব শিক্ষার মূল।

যদি শরীরে বল বা স্বাস্থ্য না থাকে, তাহা হইলে কোন বিদ্যা, কোন শিল্প, কোন মহত্ত্ব কিছুই কার্য্যকর হয় না। সংসারে যত লোক বড় হইয়া দশ জনের উপকার করিয়া গিয়াছেন, সে কেবল মানসিক উৎকর্ষতার গুণে নয়—পরন্তু তাঁহাদের শারীরিক উৎ-কর্ষতাও অধিক ছিল। সে বিদ্যার কি উপকার যে বিদ্যা শিখিতে গিয়া একজন চিরদিনের মত তাহার স্বাস্থ্য বা হৃদয়ের মহত্ত্ব নষ্ট করিল? এ কারণ পণ্ডিতগণ আজ কাল বিদ্যালয়ে ব্যায়াম শিক্ষার প্রবর্ত্তনায় চেষ্টিত আছেন। শুদ্ধ বিদ্যালয়ে কেন, যাহাতে শৈশবাবস্থা হইতে লোক ব্যায়ামকে গৃহশিক্ষার অঙ্গ করে, সে চেষ্টাও চলিতেছে।

ব্যায়াম তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

ব্যায়ামকে পণ্ডিতেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রথমতঃ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার উদ্দেশ্যে এবং তৃতীয়তঃ আমোদ আহ্লাদ বা ক্রীড়া কৌতুকের উদ্দেশ্যে। স্থৌল্যরোগে অর্থাৎ যে রোগে শরীর খুব মোটা হয়—সেই রোগ নিবারণ জন্য অথবা মধুমেহাদি রোগ নিবারণের জন্য যে ব্যায়াম তাহাকে চিকিৎসা-বিধায়ক ব্যায়াম বলে। আধ্যাত্মিক ও মানসিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যায়াম

শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা শিক্ষা-বিধায়ক ব্যায়াম এবং ক্রীড়া কৌতুকের জন্য যে ব্যায়াম তাহাকে আমোদ-বিধায়ক ব্যায়াম বলে। শেষোক্ত ব্যায়ামই শিশুদিগের পক্ষে উপযোগী।

শারীরিক উন্নতি এবং স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করিলে শিশুদিগের অঙ্গ চালনা অতীব প্রয়োজনীয়। আমরা যে কিছু কর্ম্ম করি, তাহা দেহাভ্যন্তরস্থ পেশী সকলের প্রসাদে। পেশী শক্তিহীন হইলেই আমরা জড় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ি। কিন্তু চালনা ব্যতীত পেশীর এই শক্তি কিছুতেই আপনাপনি বৰ্দ্ধিত হয় না। অনেকের এই ধারণা আছে যে পুষ্টিকর খাদ্য পাইলেই পেশী সকল বৰ্দ্ধিত হয় ও শারীরিক বল লাভ করা যায়। কিন্তু এই ধারণা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, খাদ্য হইতেই রস, রক্ত, মেদ, মজ্জা, অস্থি, পেশী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু এই খাদ্য ছাড়া আর একটা দ্রব্য আছে যাহা না হইলে শরীরে শক্তির সঞ্চার হয় না এবং সেই জিনিষেরই নাম কর্ম্ম বা চালনা। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, পা ভাঙ্গিয়া গেলে এবং কাষ্ঠ খণ্ড (Splint) দ্বারা যোড়া দিলে পরে পেশী সকল আপনাপনি সঙ্কুচিত হইয়া শুকাইয়া যায়। ভগ্নপদ ব্যক্তি হাজার পুষ্টিকর খাদ্য আহার করুক্ না কেন, একমাত্র চালনার অভাবে তাহার পেশী সকল অকর্ম্মণ্য হইবে ও গুড়াইয়া যাইবে।

শিশুদিগের অঙ্গ-চালনা।

আজকাল শিশুদিগের মধ্যে যে অনেকের অবয়ব সকল অসম পরিমাণ দেখা যায়, তাহার কারণ চালনার অভাব। পল্লীগ্রামবাসী শিশুগণ সদা সর্ব্বদা খেলাধূলা করে বলিয়া তাহাদের মধ্যে অসমাবয়ব প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু সহরে অনেক ছেলে দেখা যায় যাহার পেটটি

চালনার অভাবে শিশুগণের অসম অবয়ব।

মোটা, হয় তো পা দুখানি সরু; গলা সরু, হয় তো মস্তক গলার সম পরিমাণ নয়। ইহার কারণ সহরের ছেলেরা বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হয়। দিবা রাত্রি দাস দাসী তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, অতি অল্প সময়ই তাহারা নিজ নিজ শরীর চালনের স্ফূর্ত্তি পায়। সুতরাং তাহাদের কি পেশী, কি অস্থি, কি হৃদয়, কিছুই বর্দ্ধিত হইতে পারে না। চালনা ব্যতীত শরীরের পেশী সকল কঠিন, দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক হয় না। আবার পেশী সকল কর্ম্মঠ ও দৃঢ় না হইলে অস্থি সকল পরিপুষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে অস্থিস্থিত পেশী সকলের বৃদ্ধিতে হৃদয়ও বর্দ্ধিত হয়। চালনাতে শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র সকলও কর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে শারীরিক উন্নতি, বল, দৃঢ়তা, পৌরুষ, পরাক্রম, হৃদয়ের বিস্তৃতি, অঙ্গের সুঠামতা প্রভৃতি শরীরের সম্বন্ধে যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়, তৎসমুদয়ই শরীরের চালনা বা ব্যায়াম হইতে লাভ করা যায়। শৈশবকাল হইতে যদি এই শারীরিক চালনা যথাযথ ভাবে সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে শরীরের কোন অবয়বের হীনতা বা অতিরিক্ততা থাকিলে, তাহারাও নির্দ্দোষ হইয়া সমভাব প্রাপ্ত হয়। এই পেশী সকলের চালনাতেই শরীর সমাবয়বসম্পন্ন ও সুশ্রী হয়।

শিশু-শরীরের দৃঢ়তা।

শরীরের দৃঢ়তা স্বাস্থ্যের প্রধান লক্ষণ। শরীর দৃঢ় না হইলে কোন শিশুকে প্রকৃত সুস্থ বলা যায় না। এই দৃঢ়তা নানা প্রকারে সম্পাদিত হইতে পারে। চর্ব্বি প্রভৃতির বিস্তৃতিতে শরীর মোটাসোটা দেখায় বটে, কিন্তু সে স্থূলতা কোন কার্য্যকরী নহে। পেশী সকলের শক্তিজনিত যে দৃঢ়তা, সেই দৃঢ়তা লাভ করিলেই শরীর সুস্থ ও সবল এবং কষ্টসহ হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে, শরীরে যে জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত থাকিয়া আহারাদির পরিপাক, রস রক্তাদির পরিণতি ও মল মূত্রের প্রবর্ত্তনা করিতেছে, সকলি এই পেশীর চালনাতে। পেশীকেই

মহানস বলা যায়। পেশীর চালনাতে ক্ষুধার বৃদ্ধি, রক্তস্রোত প্রধাবিত, মলমূত্রের প্রবর্ত্তন এবং শরীরে প্রতি পলকে যে সকল পরিবর্ত্তন হইতেছে সমুদায়ই সংঘটিত হয়। পেশী সকল আকর্ষণ করিয়া অস্থির কেবল মাত্র আকার বিধান করে—তাহা নহে। পরন্তু উহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অস্থির পুষ্টি ও বৃদ্ধির কারণ। পদাদি অবয়ব সকলকে যদি সবল ও সুদৃঢ় করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ সকল অবয়ব সংক্রান্ত পেশী সকলের প্রভূত চালনা করা চাই। নিয়ত পথপর্য্যটনকারী ডাক্-হর্করা বা পাল্কী-বাহক বেহারাদের যে পা ও স্কন্ধ স্থূল ও দৃঢ় হয়, তাহাও এই পেশীর জন্য। চালনা ব্যতীত পেশীর শক্তিবিধান হয় না। পেশীর শক্তিবিধান না হইলে অস্থি বা হৃদয় কিছুই বৰ্দ্ধিত হইতে পারে না। দুর্ব্বল লোকদিগের যে হৃদ্‌যন্ত্রও দুর্ব্বল হয়, তাহা কে না জানেন? আবার হৃদ্‌যন্ত্র দুর্ব্বল হইলে শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রও কার্য্যক্ষম হয় না। সুতরাং পেশীর চালনার উপরই সমস্ত নির্ভর করে; এবং চালনা দ্বারা এই পেশীর দৃঢ়তাতে শরীর যে দৃঢ় হয়, সেই দৃঢ়তাই উপকারী। নতুবা অপরাপর উপায়লব্ধ দৃঢ়তা কোন কার্য্যেরই নয়।

শিশুদিগের স্বাভাবিক অঙ্গচালনা।

যত দিন না শিশু হামাগুড়ি দিতে শিখে, ততদিন তাহাকে প্রত্যহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলের যথেষ্ট চালনা করিবার অবসর দিতে হয়। হাত দিয়া কোন বস্তু ধরিতে যাওয়া কিম্বা বসিবার চেষ্টা করা, ইহাও ব্যায়ামের প্রকারান্তর। পঞ্চম মাস হইতে সপ্তম মাস পর্য্যন্ত শিশু বসিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সে চেষ্টা কিছুক্ষণের জন্য। সাত আট মাস বাদে ইহারা হামাগুড়ি দিতে শিখে; এবং তখনও প্রকারান্তরে ইহাদের ব্যায়াম করা হয়। সেই সময় দেখিতে হয় যেন তাহার শরীরে কোন আঘাত না লাগে, অথবা সে বেশী হামাগুড়ির শ্রম না করে। কোন কোন শিশু হামাগুড়ি দিতে পারে না, কেবল পাছায় হাঁটে। ৮

মাস হইতে ১২ মাসের মধ্যে ইহারা চেয়ার প্রভৃতি ধরিয়া দাঁড়াইতে শিখে। এই সময়ই ইহাদের পড়িয়া যাইবার বেশী সম্ভাবনা। ১০ মাস হইতে ১৮ মাস পর্য্যন্ত শিশুর হাঁটিবার সময়। তবে কোন কোন শিশু দুই বৎসরে হাঁটিতে শিখে। হাঁটিবার সময় হইতেই শিশুর সমুদায় পেশীর চালনা হইতে থাকে। এ সময় শিশু আপনাপনি যেরূপ অঙ্গচালনা করে, তাহার বিরুদ্ধে জোর করিয়া তাহাকে কোন অঙ্গচালনা করিতে দিতে নাই। অথবা তাহার অঙ্গচালনায় বাধা দিতে নাই। দুই বৎসর পরে শিশুদিগকে মাঠে বেড়াইতে দেওয়া মন্দ নয়; কেন না তথায় ঘাসের উপর পড়িয়া গেলে তাহাদের ততটা আঘাত লাগে না। তিন বৎসর বয়সে তাহাদিগকে একটু একটু দৌড়িতে দিলে ভাল হয়।

নবজাত শিশুর অঙ্গ চালনা বা ব্যায়াম—

এক মাসের পর হইতেই আরম্ভ করা যাইতে পারে। কতকগুলি অঙ্গচালনার বিবরণ ও চিত্র দেওয়া হইল। প্রথমে ১টা অঙ্গচালনা আরম্ভ করিতে হইবে। পরে তিন মিনিট বিশ্রাম দিবে। প্রতি ১৫ দিন অন্তর এক একটা নূতন অঙ্গচালনা বাড়াইয়া দিবে।

এই অঙ্গচালনা গুলি আস্তে আস্তে Rythmically করাইতে হইবে। আহারের দুই ঘণ্টা পরে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে অভ্যাস করাইবে। এবং ব্যায়ামগুলি ঠিক পরে পরে করান আবশ্যক; তাহা হইলে শিশুর স্মৃতি শক্তির বিকাশের সাহায্য হইবে।

টেবিলের উপর নরম বিছানায় শিশুকে শোয়াইবে। খোলা শরীরে অথবা গায়ে ঢিলা পোষাক দিয়া ব্যায়াম করান উচিত। এক মাস বয়স হইলে এই সকল ব্যায়াম আরম্ভ করা যাইতে পারে। চৌদ্দ দিন অন্তর ২ মিনিট করিয়া সময় বাড়াইবে। এবং দুই সপ্তাহ অন্তর নূতন ব্যায়াম আরম্ভ করিবে। ধীরে ধীরে অঙ্গ সঞ্চালন করিবে। শিশুর

প্রফুল্ল অন্তরে ও খাওয়ার দুই ঘণ্টা পর সকালে ৮টা ৯টার সময় ব্যায়াম প্রশস্ত। অপরাহ্নে ৪।৫ টার সময়ও হইতে পারে।

হাত সঞ্চালন—ইহাতে বক্ষঃ, পৃষ্ঠ ও বাহুর উপরি ভাগ সবল হয়।

১। শিশুর দুই হাত উঠাইয়া পরে টেবিলের উপর দেহের সহিত সমকোণ করিয়া নামাইবে। আবার আস্তে আস্তে হাতে তালি দিবার ন্যায় উঠাইবে। এই প্রকার ব্যায়াম ৪ বার করিবে। (১ম ও ২য় চিত্র)।

২। দেহের সহিত সমান্তরাল করিয়া মাথার পিছনের দিকে দুই হাত নামাও, তার পর আস্তে আস্তে মাথার উপর উঠাও। শিশু যদি দুই হাত তুলিতে বিরক্তি বোধ করে, তবে প্রথমে এক হাত, পরে আর এক হাত সঞ্চালন করিবে। (৪র্থ চিত্র) এই দুই ব্যায়ামেই হাতের কনুই সরল রাখিবে।

পদ সঞ্চালন—উহাতে পায়ের মাংসপেশী সবল হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।

১। পা ধরিয়া কনুই দেশকে শরীরের দিকে নমিত কর। প্রথমে ডান ও পরে বাম পা দ্বারা এই ব্যায়াম ৪ বার করিবে। পরে দুই পা দ্বারা একত্র ৪ বার এই ব্যায়াম করিবে। (৩য় চিত্র)।

২। পা ধরিয়া কনুইকে সরল ভাবে রাখ। তার পর আস্তে আস্তে উহাকে শরীরের সহিত সমকোণ করিয়া উঠাও। প্রত্যেক পা ক্রমে ৪ বার করিয়া উঠাইবে ও নামাইবে, তার পর দুই পা একত্রে ৪ বার উঠাইবে ও নামাইবে। পাশের দিকে পা উঠাইবে বা নামাইবে না (৫ম ও ৬ষ্ঠ ব্যায়াম)।

শিশু যখন নিজে মাথা উঠাইতে সক্ষম হইবে, তখন মা বা ধাত্রীর হাত ধরিয়া যত দূর সম্ভব শিশুকে মাথা উঠাইতে দিবে। শক্ত করিয়া শিশুর হস্ত ধরিবে যেন হাত ছাড়িয়া হঠাৎ চিৎ হইয়া না পড়িয়া যায়।
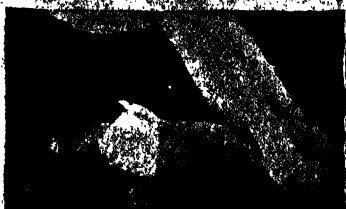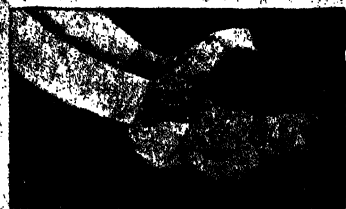
শিশুদের অঙ্গচালনা।

শিশুকে টানিয়া উঠাইবে না। কিন্তু তাহাকে আস্তে আস্তে নিজে উঠিতে শিখাইবে। (৭ম ও ৮ম চিত্র)।

বড় শিশুদের অঙ্গচালন—বড় শিশুদের নানা প্রকারে অঙ্গচালনা হইতে পারে। কিন্তু এই অঙ্গ চালনা অতি সাবধানে করিতে হইবে। বড় শিশুর অঙ্গচালনার পূর্ব্বে ডাক্তার দ্বারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করাইতে হইবে। কিরূপ চালনা কোন্ শিশুর পক্ষে খাটিবে তাহা ডাক্তার মহাশয় বলিয়া দিবেন। শিশুর হৃদ্‌যন্ত্রে কোন রোগ আছে কি না, পৈতৃক ব্যাধি কিছু লুক্কায়িত আছে কি না, শিশুর শরীরে কিরূপ ব্যায়াম সহিবে—তাহা ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া তবে ব্যায়াম করিতে দেওয়া উচিত। নতুবা ব্যায়াম বা অঙ্গ চালনার অতিযোগে বা মিথ্যা যোগে নানাপ্রকার ব্যাধি জন্মিতে পারে। এমন কি কোন কোন স্থানে প্রাণ সংশয় ঘটিয়া থাকে। বাইসাইকেল অতি দ্রুত ভাবে চালাইয়া কত লোক বধির হইয়াছে, অথবা ফুটবল খেলা বা সন্তরণ করিতে গিয়া কত লোক মারা পড়িয়াছে, তাহা কে না জানেন? এমন কোন সাধারণ নিয়ম করা যায় না, যাহা সকলের দেহের পক্ষে খাটিবে। ভিন্ন ভিন্ন শিশুর ভিন্ন ভিন্নরূপ শক্তি ও সহিষ্ণুতা; সুতরাং ডাক্তারের পরামর্শ মতে সেই সকল ব্যায়াম হওয়া উচিত। এমন অনেক রোগ বা শরীরের অবস্থা শিশুর থাকিতে পারে, যাহাতে ব্যায়াম একেবারেই তাহার পক্ষে পরিবর্জ্জনীয়।

যে সকল সন্তানের শরীর দুর্ব্বল, চিত্রে প্রদর্শিত ব্যায়ামগুলি তাহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

১। দুইটি খুঁটা খাড়া পুতিয়া তাহাদের মধ্যে একটা লম্বা লৌহ-দণ্ড ভূমির সহিত সমান্তরাল ভাবে বাঁধিবে। শিশুকে ঐ সমান্তরাল দণ্ড ধরিয়া ঝুলিতে দিবে। (৩ নং চিত্র)।

২। মাটীতে কম্বল বিছাইয়া বা কঠিন শয্যায় সন্তানকে শোওয়াইবে।

পরে এক এক করিয়া হাঁটু বুক পর্য্যন্ত উঠাইবে। এই প্রকার ৪ বার উঠাইয়া পরে দুই হাঁটু একত্র ৪ বার উঠাইবে। (১নং চিত্র)।

৩। দাঁড়ান অবস্থায় এইরূপ ব্যায়াম করাইবে।

৪। কঠিন শয্যায় চিৎ করিয়া শোওয়াইবে। পরে ডান পা এবং বাম পা একে একে পিঠের সহিত সমকোণ করিয়া উঠাইবে ও নামাইবে। এইরূপ প্রত্যেক পা ৪ বার করিয়া দুই পা একত্র ৪ বার উঠাইবে। (২ নং চিত্র)।

২, ৩ ও ৪ নং ব্যায়াম দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়, পৃষ্ঠদেশের মাংসপেশী সবল হয় এবং সহজে রক্ত সঞ্চালন হয়।

৫। পা লম্বা করিয়া ছড়াইয়া ও বুকের উপর হাত জোড় করিয়া কঠিন শয্যার উপর সন্তানকে শোয়াইবে ; তাহার পর আস্তে আস্তে কোমর পর্য্যন্ত শরীরকে উঠাইয়া নামাইবে। এই ব্যায়াম ৪ বার (৪র্থ চিত্র)।

৬। মাথার পেছনে হাত রাখিয়া উপরি উক্তভাবে ব্যায়াম করাইবে।

৬। মাথার উপর হাত লম্বা করিয়া ৫নং ব্যায়াম করাইবে। (৫ নং চিত্র)।

৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম ব্যায়্যামে স্কন্ধ দেশ, বক্ষঃ ও পিঠের মাংস পেশী সবল হয়। ইহা ব্যতীত ২।৩।৪ নং ব্যায়ামেরও ফল পাওয়া যায়।

বালকদিগের ব্যায়াম

দ্বাদশ অধ্যায়।

খোকার কান্নাকাটী।

প্রথম প্রসূতি বা 'পোয়াতি' ছেলের মুখ দেখিয়া চোখ জুড়ান, বুকের ভিতর নূতন স্নেহের অপূর্ব্বত্ব অনুভব করিয়া স্বর্গের সুখ ভোগ করেন। কিন্তু মায়ে ও ছেলের একটা বুঝাপড়া,—ঠিকমত বনিবনাও হইতে একটু বিলম্ব হয়। শিশুহৃদয়ের রহস্যে অনভিজ্ঞতাই ইহার কারণ। মায়ের কোলের মাণিক, হেমন্তের উজ্জ্বল নিটোল শিশির বিন্দুর মত সেই এক ফোটা ছেলের ভাষা—কান্না। সেই কান্না কখন উচ্চ, কখন মৃদু, কখন অস্পষ্ট গুঞ্জনের মত। খোকার কান্নার সুরে তাহার শরীর মনের সব রকম বিচিত্র ভাব ফুটিয়া উঠে। নবীনা জননী সব সময়ে সেই কোমল কান্নার অর্থটা ঠিকমত ধরিতে পারেন না, আবার কখন কখন একেবারে উল্টা বুঝিয়াও বসেন, তাই মা ও ছেলের মধ্যে প্রথম প্রথম একটা ভাবের বিরোধ ঘটে।

এই বিরোধটা ঘুচাইবার জন্য খোকা যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটী করে না। সে তাহার মায়ের মধুমাখা কথাগুলি শিখিয়া মাকে প্রাণের ব্যাথা ও কথা জানাইবার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকে। কিন্তু যতদিন তাহার কথা না ফুটে, ততদিন এই ভাবের ও ভাষার বিরোধ মিটাইবার জন্য,—খোকার কান্নাকাটীর অর্থ বুঝিবার জন্য, একটু চেষ্টা করা, একটু কষ্ট স্বীকার করা প্রসূতির পক্ষে দোষের কথা নয়। বরং খোকার কান্নাকাটীর মানে বুঝিয়া লওয়া মায়ের পক্ষে খুব প্রয়োজনের ও প্রশংসার কথা।

শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে তাহার কোমল মধুর কণ্ঠের কলনিক্কণে অবসন্ন, কণ্ঠাগতপ্রাণ জননীকে রোমাঞ্চিত করিয়া কাঁদিয়া উঠে। সংসারের রঙ্গভূমিতে আসিয়াই সেই কান্না খোকার প্রথম অভিযোগ।

সে সকলকে উচ্চৈঃস্বরে ও মুক্তকণ্ঠে জানাইয়া দেয়, গর্ভে সে যেমনটি ছিল এখন আর তেমনটি নাই, সে পুষ্পরথ হইতে পৃথিবীর কঠিন মাটীতে নামিয়াছে। পৃথিবীর বাতাসে তাহার পুষ্পাধিক কমনীয় অঙ্গ বিনোদিত হইতেছে না। এমনই করিয়া সূতিকাগৃহে প্রথম শ্বাসের সহিত মানবের কান্নার সুরু। তার পর কোথায় যে সে কান্নার শেষ, তাহা,—যিনি হাসি-কান্না দিয়া এই জগৎ গড়িয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন।

এখন শিশুর কোমল-কণ্ঠোত্থিত কান্নার অর্থ একবার বুঝিতে চেষ্টা করিলে হয় না? খোকার কান্না বুঝিলে আমরা তাহার মেজাজ ও মরজি, সুখ ও দুঃখ বুঝিতে পারিব। আসুন একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।

খোকার প্রথম কান্নাটা, অস্বস্তির কান্না। সে কান্না, করুণ আর্ত্তনাদ। আমাদিগের কাণে ও প্রাণে ঐ কান্না আনন্দ সুধা ঢালিয়া দিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে খোকার প্রথম কান্না বড় করুণ, বড় মর্ম্মস্পর্শী। উহা বিরাগের মৃদু গুঞ্জনও নহে এবং যন্ত্রণাবোধের তীব্র চীৎকারও নহে, উহা সুস্পষ্ট অথচ ব্যথাভরা। এই প্রথম কান্নার পরে যখন খোকা আবার কাঁদে, সে কান্নার অর্থ আলাহিদা। তাহাতে খোকার অভাব অভিযোগ ব্যক্ত হইয়া থাকে। বড় গুমট, খোকা কাঁদিতেছে, বাতাস দেও, বাহিরে লইয়া যাও। বিছানার কাঁথা কাপড় নষ্ট হইয়াছে, খোকা কাঁদিতেছে, —বিছানা বদলাইয়া দাও। শয়ন করাইবার দোষে হাত পা আড়ষ্ট হইয়াছে, খোকা কাঁদিতেছে, তাহাকে ভাল করিয়া শোয়াও। খোকা কেন কাঁদে, কি কারণে কাঁদে, তাহা বুঝিবার ও খুঁজিবার ভার পোয়াতির উপর।

এই সব কান্নার পর 'ক্ষুধার কান্না'। এই কান্না-শুনিতে অনেকটা অস্বস্তির কান্নার মত। কেবল কান্নার সুরে অসহিষ্ণুতার একটু রেশ জড়ান থাকে। ক্ষুধার্ত্ত খোকা, অস্বস্তিপীড়িত খোকার ন্যায় ছট্‌ফট্ করে না। সে ক্ষুধার সময় মায়ের দেখা পাইলে ও দুধের বাটী কিংবা

বোতল দেখিলে তৎক্ষণাৎ শান্ত হয়। কিন্তু ঐ কান্নার সময় যদি কেহ খোকাকে দুধ না খাওয়ায়, তাহা হইলে তাহার কান্নার সুরের পরদা খুব চড়িতে থাকে।

খোকার বিরক্তির কান্নাটা মৃদু ও করুণ। কান্নার শব্দগুলি অনেক সময় অনুনাসিক। ধাত্রী ও জননীরা ইহাকে খোকার 'খুঁৎখুঁতনী' বা "খ্যাঁতখ্যাঁতানি" বলিয়া থাকেন। খোকার এই কান্নাটা যন্ত্রণাবোধের লক্ষণ না হইলেও সে খুঁৎখুঁৎ করিয়া নাকে কাঁদিয়া বলে, 'কিছু ভাল লাগিতেছে না।' আমোদ পাইবার ও বাহিরে যাইবার ইচ্ছা হইলে, অল্প পেটের অসুখ করিলে, মাথা ধরিলে, বোতাম, ফিতার গ্রন্থি ও মাদুরের বেতি প্রভৃতি গায়ে ফুটিলে, ঘুম পাইলে, মুখে ঘা হইলে, গাত্রের নোহা ছাল উঠিয়া গেলে, মায়ের কোলে উঠিবার ইচ্ছা হইলে, খোকা খুঁত্‌খুঁত্‌ করিয়া এমনই নাকে কাঁদিয়া থাকে।

খোকার যাতনার কান্না উচ্চ ও অতি তীব্র। যে সব খোকা খুকীর বয়স তিন মাসের বেশী হইয়াছে, তাহারা যন্ত্রণা পাইলে, কাঁদিবার সময় তাহাদের চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। ছেলেদের যন্ত্রণা যত অধিক হয়, তাহাদিগের কান্নাটাও তত তীক্ষ্ণ তীব্র হইয়া থাকে। খোকাদের 'পেট কামড়ানি' হইলে এই কান্না খুব প্রবল হয়। গায়ে আলপিন ও সূচ ফুটিলেও ঐরূপ কান্না সম্ভব; সুতরাং সে দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার।

খোকা যদি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াই তৎক্ষণাৎ থামিয়া যায়, আবার চাপা ভাঙ্গা গলায় কাঁদে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে খোকার ফুস্‌ফুসের অন্তরণের প্রদাহ বা Pleurisy হওয়াতেই সে ঐরূপ কাঁদিতেছে। শ্বাসযন্ত্রের আবরণীর প্রদাহ হইলে খুব যন্ত্রণা বোধ হয়, তাই খোকা কাঁদিয়া উঠে, কান্নায় জোরে শ্বাসপ্রশ্বাস বহাতে যন্ত্রণা অতি তীব্র হয়; আর অমনই তাহার কান্না বন্ধ হইয়া যায়।

খোকা যখন যন্ত্রণায় কাঁদে, সেই সময়ে লক্ষ্য করিলে যদি দেখা যায়, সে মাথাটা একদিকে নোয়াইতেছে, কি একটা হাত কাণের কাছে তুলিতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার কর্ণশূল বা 'কাণকামড়ানি' হইয়াছে।

ঘুঙড়ি কাসির চাপা কান্না শুনিয়া সব পোয়াতিই উহার কারণ বুঝিতে পারেন। কান্নার ঐ প্রকার চাপা শব্দ শুনিলেই বুঝা যায়, শিশুর কণ্ঠতন্তুর (vocal cords) কোনরূপ বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

খোকাদের ভয়ের কান্না কেমন, তাহা ঠিক করিয়া লইতে বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক হয় না,—ভয়ের কান্নার সুরে হৃদয়ের চাঞ্চল্য ও ত্রাস বেশ ফুটিয়া উঠে। অবসাদের কান্নাও পোয়াতিরা বুঝিতে পারেন।

হতাশের কান্নাটিও একটু চেষ্টা করিলে বেশ ধরিতে পারা যায়। মুখে ঘা হইয়াই হউক, সর্দ্দিতে নাক বন্ধ হইয়াই হউক, কিংবা মায়ের স্তনবৃন্তের গঠন দোষেও হউক অথবা জিভ ফুলিয়াই হউক, খোকা খুকীরা যখন মায়ের স্তন্যপানে বাধা পায়, তখনই তাহাদিগের এই হতাশের কান্না শুনিতে পাওয়া যায়।

মায়ের ও পরিজনের বড় আদরের ধন খোকা ভূমিষ্ঠ হইবার পর, প্রসূতি যদি তাহার কান্নাগুলি কয়েক সপ্তাহ মন দিয়া শুনেন,—কান্নার স্বরসপ্তক সাধন করেন, তাহা হইলেই তিনি তাহার কান্নার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। সুতরাং কোন্ কান্না বাস্তবিক গুরুতর আর কোন কান্না তুচ্ছ, তাহা বুঝিয়া চলিতে ও অবস্থা জানিয়া ব্যবস্থা করিতে পারেন। সকল মায়েরই বুঝিয়া রাখা উচিত, অকারণে খোকা খুকীরা কখনও কাঁদে না। ছেলে যদি সুস্থ সবল, হৃষ্ট ও পুষ্ট হয়, সময়মত খাইতে ও ঘুমাইতে পায় তাহাকে পিপাসার কষ্ট সহ্য করিতে না হয়, তাহা হইলে সে মোটেই কাঁদে না।

অনেকে হয় ত মনে করিয়াছেন, আমরা 'খোকা মহারাজ' ও 'খুকীরাণীর'

মেজাজ ও রোখের কান্নার কথা বলিতে ভুলিয়াছি। কিন্তু কথাটা ভুলিবার নয়। কারণ আমরা অনেক সময়েই পোয়াতিকে সপ্তমস্বরে রোরুদ্যমান খোকা খুকীর গালে বিরাশী সিক্কার ওজনে চড় কসাইয়া দিতে দেখিয়াছি, এবং তাঁহাদের বলিতে শুনিয়াছি,—"কিচ্ছুই হয়নি, শুধু শুধু বদমেজাজী কান্না জুড়েছে—ও—।" কোন খোকা কাঁদিয়া বদমেজাজ দেখাইলে বুঝিতে হইবে, হয় সে একটু আদর পাইবার জন্য ঐরূপ করিতেছে, নয় ত আর কেহ তাহাকে বিরক্ত করিয়াছে। সুতরাং কান্নার জন্য খোকা দোষীও নহে এবং দণ্ডনীয়ও নহে; যে খোকাকে কাঁদাইয়াছে, পদ্মহস্তের চড় চাপড়গুলা তাহারই ন্যায্য প্রাপ্য। বদমেজাজী কান্নার কথা ত স্বতন্ত্র, বাঙ্গালার বধূ-রাজ্যের অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা, ঐ দুধের ছেলের, ঐ কচি কমলের মত এতটুকু খোকার উপর দিয়া বহিয়া যায়। খোকাদের অদৃষ্ট !

ছেলে কোনরূপ জেদ লইয়া কাঁদিলে, যদি তাহাকে শান্ত করিবার জন্য তাহার জেদ বজায় করা যায়, তাহা হইলে ক্রমশঃ তাহার বদমেজাজ, রাগ এবং আদেশ অমান্য করা দোষগুলি তাহার মনে অঙ্কুরিত হয় ও বদ্ধমূল হইতে প্রয়াস পায়। যদি তাহার কান্নার দিকে কোনরূপ লক্ষ্য না করা হয় এবং যে সকল দ্রব্যের জন্য শিশু কাঁদিতেছে তাহা তাহাকে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে শীঘ্রই আত্মদমন (Self control), আত্মনির্ভর, (Self-relinace) এবং গুরুজনের প্রতি ভক্তি (respect for law and authority) করিতে শিক্ষা করিবে।

শিশু-বশীকরণ।—প্রকৃতির প্রেরণায় প্রায় সব নারীই 'ছেলের মা' হইয়া থাকেন। কিন্তু ছেলেকে বশীভূত করিয়া সুপথে চালাইবার বিদ্যা অনেক মাই জানেন না। তাই ছেলে বিগড়ায়। ছেলে বিগড়াইলে, উল্টা উৎপত্তি হয়,—সে মাতার শাসন মানা দূরে থাকুক, নিজেই তাহার মাকে শাসন করিতে থাকে। তাই 'কাঁচা' থাকিতেই ছেলে

বশ করিতে হয়। এই কাঁচা বয়স কাটিয়া গেলে ছেলে বশ হয় না বলিয়া, বাঙ্গালায় এই পল্লী প্রবচন প্রচলিত আছে :—

"কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ,
পাকায় করে ট্যাঁস ট্যাঁস।"

দেশে 'বিগড়ান' ছেলের দৃষ্টান্ত ঢের আছে। আজ আমরা একটা বিলাতি দৃষ্টান্ত দিয়া মহিলা পাঠিকাদিগকে কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। দুইটী মহিলা একদিন দোকানে ঘুরিয়া "বাজার" করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের সম্মুখে একটী ছোট গাড়ীতে তিন বৎসরের এক খোকা। তাহারা চলিতে চলিতে গাড়ীখানি ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। খোকার চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি, এবং মুখের গালভরা হাসি চারিদিকে আনন্দ ছড়াইতেছিল। একটু পরেই খোকা ঠাওরাইয়া লইল যে, গাড়ী বাড়ীমুখ হইয়াছে; অমনই সে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। খোকার মা কিন্তু সে দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না। কিন্তু খোকার মুখের হাসির আলোটা তৎক্ষণাৎ নিবিয়া গেল-সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে ক্রোধ-লক্ষণ ফুটিয়া উঠিল। তাহার চীৎকার পথের সুদূর প্রান্ত হইতে শুনা যাইতে লাগিল। খোকার মা খোকার কান্না থামাইবার জন্য একটু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ছেলে থামিল না। তখন তিনি সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া একটু মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন, "খোকা যে দিকে যাইতে চাহিতেছে সেই দিকেই যাই চল।" তাহাই হইল। তখন খোকার মুখে হাসির জ্যোৎস্না ফুটিল। দেখিতে দেখিতে খোকা, খোকার মা ও তাহার সঙ্গিনী পথের জনপ্রবাহে মিশিয়া গেলেন। কিন্তু সেই দিন হইতে ছেলে নিজের কান্নার জোরটা বুঝিয়া রাখিল,—ভবিষ্যতে জননীকে সে ইচ্ছামত ঘুরাইতে ফিরাইতে পারিবে। একটী স্ত্রীলোক মা ও ছেলের কাণ্ড দেখিয়াছিল। সে বলিতে বলিতে গেল :—"ওমা, তিন বছরের এই একরত্তি কচি ছেলে, একেই বশ করিতে পারে না,—ছেলে যখন ষোল

বছরের হবে, তখন ছেলের উপর আর কি কোন জোর খাটিবে?" আমাদের দেশে মায়ের দোষে অনেক 'ছা' বিগড়ায়—আর আলালের ঘরের দুলালের দল বাড়ে। শেষে সাধ্য সাধনা করিয়া সেই সব ছেলেকে খাওয়াইতে পরাইতে মায়ের 'প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ' এবং ছেলের 'আখের' সঙ্গে সঙ্গে মাটী হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শিশু-চরিত্র অধ্যয়ন।

(Mothercraft Manual অবলম্বনে)

ছেলেদের কি করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহা জানিতে গেলে, প্রথমে ছেলেদের ভাল করিয়া জানা চাই, ভাল করিয়া বোঝা চাই। প্রত্যেক শিশুর এক একটি বিশেষত্ব আছে, দেহে ও মনে, কর্ম্মে ও চরিত্রে, দোষে ও গুণে অন্য শিশু হইতে তাহার কোন না কোন পার্থক্য আছে। প্রতি মাতা-পিতাকে প্রতি সন্তানের দোষ ও গুণ, শক্তি ও দুর্ব্বলতা জানিতে হইবে। তাহার চিন্তার ধারা কোন দিকে, তাহার প্রাণের গতি কোন মুখে তাহা বুঝিতে হইবে। প্রতি সন্তানের স্বরূপটি ধরিতে পারিলেই তাহার শিক্ষার ও পালনের পথটী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। ছেলে কি খেলে, সে কিরূপে খেলে, সে কি গল্প শুনিতে ভালবাসে, সে কি গল্প নিজে বলে, সে কি জিনিষ দেখিয়া মুগ্ধ হয়, আনন্দিত হয়, সে কি প্রকার প্রশ্ন করে, কি জানিতে, বলিতে, করিতে চায়—এইরূপে ছেলেদের খেলায়, গল্প শোনায়, কথা বলায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় তাহাদের দেহের ও অন্তর প্রকৃতির বিশেষ রূপটি ধরা পড়ে।

পুত্রদের পর্য্যবেক্ষণ করিবার একটি পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া গেল।

নামঃ—	বয়স ঃ—	বছর	মাস	সপ্তাহ
লম্বা ঃ—(দাঁড়াইয়া)	ইঞ্চি	সাধারণ মাপের	উপর	নীচে
লম্বাঃ—(বসিয়া)	ইঞ্চি	সাধারণ মাপের	উপর	নীচে
ওজন ঃ— মণ	সের	সাধারণ ওজনের	বেশী	কম
পরিধি ঃ— মাথার	বুকের	পেটের		

বক্ষের ব্যাস ঃ—বুকের মাঝখান হইতে পিঠের শিরদাঁড়া পর্য্যন্ত ইঞ্চি
বুকের মাঝখান হইতে বগল পর্য্যন্ত ইঞ্চি

বক্ষঃ ফুলাইলে ইঞ্চি

হস্তের দৈর্ঘ্য ঃ— পদের দৈর্ঘ্য ঃ—

দেহ পর্য্যবেক্ষণ।

(বামদিকের কলমটি স্বাস্থ্যের ও দক্ষিণ দিকেরটি অস্বাস্থ্যের লক্ষণ)

সাধারণভাবে দেখিতে	বলবান	দুর্ব্বল
	তেজস্বী	অবসন্ন
কিরূপে দাঁড়ায়	সোজা	বেঁকিয়া
		বুক ভিতরে
		মাথা সামনে
		পেট সামনে
কিরূপে বসে	সোজা	বুক নুইয়া পড়ে
	কটিভর করিয়া	পিঠ বেঁকিয়া যায়
কিরূপে চলে	সাধারণভাবে	এঁকিয়া বেঁকিয়া
	দ্রুতগতিতে	ধীরে ধীরে
মাথার আকার	সাধারণ	অসমান
চুল	খুব বেশী	খুব কম
	মিহি	মোটা
অবয়ব	সুগঠিত	সব অঙ্গ সমানভাবে বাড়ে নাই
চক্ষু	নির্ম্মল	ঘোলা
	উজ্জ্বল	তেজহীন
		জলে ভরা
		ভাসা ভাসা

	ভাল	রাঙা
		কাছে দেখিতে পায় না
		দূরে দেখিতে পায় না
		টেরা
চোখের তারা	স্বাস্থ্যকর	ফোলা
		রাঙা
		অঞ্জনীওয়ালা
নাক	লম্বা	ছোট
		ঘা-ওয়ালা
		সর্দ্দি ঝরে
মুখ	সুগঠন	অসমান
	লম্বা	মুখ দিয়া নিশ্বাস লয়
		ছোট
জিহ্বা	কোন গন্ধ নাই	দুর্গন্ধময়
	পরিষ্কার	ময়লা
		মোটা
		মুখের বাহির
		মুখের সহিত জড়াইয়া
দাঁত	সবগুলি বাহির হইয়াছে	কতকগুলি বাহির হয় নাই
	সুগঠিত	মুখের বাহিরে আসিয়াছে
	ভাল	Tartar জমে
		রং সাদা নয়
দাঁতের মাড়ি	স্বাস্থ্যকর	বিবর্ণ
		রক্ত পড়ে
		ফোলে

		অতি নরম
		ময়লা জমে
গলা	পরিষ্কার	টন্‌সিল বড়
		ফোলে
	স্বাস্থ্যসম্পন্ন	ঘা হয়
		কাসে
ঠোঁট	রাঙা	রক্তহীন
		সরু
		ফোলা
চিবুক	দৃঢ়	লম্বা
কাণ	লম্বা সাধারণ	ছোট
		খারাপ গড়া
		রস পড়ে
		ব্যথা হয়
		অত্যন্ত বড়
চামড়া	দোষহীন	ময়লা
	পরিষ্কার	খোস, চুলকনা ভরা
	রক্তাভ	ফ্যাকাসে
		অত্যন্ত নরম
মাংসপেশী	দৃঢ়	শিথিল
	সুগঠিত	দুর্ব্বল
পিঠ	সোজা	বক্র
বক্ষঃ	প্রশস্ত	ভিতরে বসা
	উন্নত	সরু
	বিশাল	হাড় বাহির করা

	বেশ ফোলে	কিছু ফোলে না
তলপেট	মাংসপেশীবহুল	শিথিল-মাংসপেশী
		অতি শক্ত
		অতি প্রশস্ত
হাতগুলি	সমান লম্বা	অসমান
	সোজা	সন্ধিস্থল অতিবড়
	সুগঠিত	
	ডান হাতে কাজ করে	আঙ্গুল খুব মোটা
	বাঁ হাতে কাজ করে	নখের রং ভাল নয়।
পাগুলি	সমান লম্বা	অসমান
	সোজা	বেঁকা
	গুলফ্ শক্ত	গুলফ্ শিথিল
স্নায়ু	দৃঢ়	দুর্ব্বল
		সহজে ভয় পায়
	শক্তি সম্পন্ন	সহজে রাগে
	সহজ	অতি চঞ্চল
		সহজে ক্লান্ত হয়
		ফিট হয়
		স্বপ্নদোষ ঘটে

দেহের উপর দখল :—

আপনি বসিতে পারে (ছয় মাস)	দাঁড়াইয়া চলিতে পারে না
হামাগুড়ি দেয় (নয় মাস)	(তিন বছর)
দাঁড়াতে পারে (এক বছর)	জিনিষ হাতে ধরিতে পারে না
চলিতে পারে (দেড় বছর)	(তিন বছর)
ছুটিতে পারে (দুই বছর)	ভাল কথা বলিতে পারে না
	(তিন বছর)

	বাটি ধরিতে পারে (এক বছর)	
	আপনি খাইতে পারে (তিন বছর)	আপন গতির উপর
	আপনি কাপড় পরিতে পারে (তিন বছর)	অধিকার নেই
	লাফাইতে পারে (চার বছর)	(চার বছর)
	ছুরি, কাঁচি ব্যবহার করিতে পারে (পাঁচ বছর)	প্যারালিসিস্
পরিপাক শক্তি	ভাল ক্ষিদে হয়	ক্ষিদে হয় না
		খাবার সময়ের মাঝে ক্ষিদে হয়
	ভাল হজম হয়	
		অতি বেশী খায়
	খাবার জিনিষ আনন্দের সহিত খায়	জিনিষ বাছিয়া খায়
		ধূলা, মাটি বা অখাদ্য জিনিষ মুখে দেয়।
		পেটে ব্যথা হয়
		পেটে গ্যাস জমে
প্রস্রাব :—	পরিষ্কার	ঘোলা
	দুর্গন্ধ নেই	রক্ত মেশানো
	কষ্ট হয় না	বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত
	সহজ পরিমাণে হয়	কষ্ট হয়
		জ্বালা করে
		অত্যন্ত বেশী হয়
		কম হয়
মল	সুগঠিত	পাতলা
		কালো বা সবুজ
		রক্তময়
		অভুক্ত খাদ্যময়

	সামান্য আম	বেশী আম
	সামান্য গন্ধ	দুর্গন্ধময়
	দিনে এক হইতে তিনবার	দিনে একবারও নয়
		বহুবার
ঘুম	শান্ত	অশান্ত
	গভীর	প্রায়ই ভেঙ্গে যায়
		স্বপ্নময়
নিশ্বাস প্রশ্বাস	গভীর	অগভীর
	নাক দিয়া	মুখ দিয়া
	নিয়মিত	তাড়াতাড়ি
	সহজ	কম
রক্তচলাচল	উত্তম	ঠাণ্ডা হাত পা
দেহের তাপ	স্বাভাবিক	বেশী

দেহের এই সব লক্ষণ মাতা-পিতারা লক্ষ্য করিতে পারেন ; ইহা ছাড়া দেহটিকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা পরীক্ষা করানো দরকার। দেহের নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি দেখানো দরকার :—

হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌, প্লীহা, যকৃত ; হার্ণিয়া ; ডাক্‌লেস্‌ গ্লাণ্ড।

বড় টন্‌সিল ; গলা ; ধমনী, রক্তের চাপ।

হাতের বা পায়ের অসমতা, চেটা পা, সরু বুক।

চোখের বা কাণের বা নাকের বা দাঁতের কোন দোষ।

রাসায়নিক পরীক্ষা :—

মূত্র : এ্যলবুমেন বা চিনি বা কোন দোষ আছে কি না

মল : কোন ক্রিমি বা অন্য রোগের বীজাণু আছে কি না।

রক্তঃ কত হোমোগ্লোবিন আছে ; সিফিলিস্‌ বা গণোরিয়া বা যক্ষ্মার কোন জীবাণু আছে কি না।

কেবল দেহের দোষ বা গুণ জানিলেই হইবে না, প্রতি দিনের অভ্যাস-গুলি দেখিতে হইবে।

অভ্যাস।

ঘুম	একা শোয়	কয়েকজন একসঙ্গে
	খোলা জায়গায়	বদ্ধ ঘরে
	নিয়মিত সময়ে শোয়	ঘুমাইবার ঠিক সময় নাই
	ভোরে ওঠে	দেরিতে ওঠে
স্নান	প্রতিদিন	কয়েকদিন অন্তর
খাওয়া	ঠিক সময়ে	অসময়ে
	সহজ সরল পথ্য	গুরুভার
	চিবাইয়া	না চিবাইয়া
	আস্তে আস্তে	অতি তাড়াতাড়ি

খাদ্যদ্রব্যে শরীর পুষ্টির সব উপাদান আছে

শিশুর খেলা	বেশ হাত পা ছুড়িতে পারে	জামা কাপড় জড়ান থাকে
	খোলা জায়গায় খেলে	বদ্ধ ঘরে খেলে
শিশুকে ঘাঁটা	সামান্য রকম	অত্যন্ত বেশী
	সহজ রকম	দোলানো, ছোঁড়া, খুব নাচান হয়

ছেলেকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে হইলে তাহার মাতাপিতার বিষয়ও জানা দরকার। প্রতি শিশু সেই বংশের দোষ ও গুণের অধিকারী। দেহের মনের বহু শক্তি শিশু মাতা পিতার নিকট হইতেই পায়। তাহার শরীরের ও অন্তরের অনেক দোষ মাতা পিতার নানা পাপের ফল। শিশুকে গঠন করিয়া তুলিতে মাতা-পিতার জীবনের ইতিহাসের দরকার; তাহা হইলে

বংশানুক্রম অনুসারে যে দোষ শিশুতে জন্মাইতে পারে তাহার সম্বন্ধে সাবধান হওয়া যায়।

বংশানুক্রম।

পিতৃকুল ; মাতৃকুল।

দৈর্ঘ্য

ওজন

ব্যবসায়

শিক্ষা

বিশেষ মানসিক শক্তি কি আছে

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য কি আছে

মদ খাওয়া

যক্ষ্মা

সিফিলিস্ বা গণোরিয়া

কে কে বাঁচিয়া আছেন

মৃত্যুর বয়স ও কারণ

দেহকে কিরূপভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; পুত্রের মানসলোকের পরিচয়টী দেহের পরিচয়ের অপেক্ষা বেশী দরকারী। কারণ মনই দেহের চালক, মনের অপূর্ব্ব অজ্ঞাত লোকে যে ইচ্ছা, আশা, ভাবের ঘাত প্রতিঘাত হইতেছে, তাহারই ইতিহাস দেহের কর্ম্মে ও চেষ্টায় প্রকাশিত হয়। মনের স্বভাবটি কিরূপ তাহা নানা কাজে প্রকাশ পায়।

মাতা পিতাকে দেখিতে হইবে পুত্র কোন প্রকৃতির।

(১) চট্‌পটে, চঞ্চল, প্রাণবান না অতিশান্ত, স্থাণুর ন্যায় নিস্তেজ অথবা দুইয়ের মাঝামাঝি।

(২) দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নিজের মত আছে, আপনার উপর বিশ্বাস আছে, অপরের দ্বারা সহজে পরিচালিত হয় না; অথবা অস্থির চিত্ত, অপরে যাহা বলে তাহাই করে, কোন কাজ আপন ইচ্ছায় করে না।

(৩) চিন্তাপ্রবণ, জিনিষের বিষয় ভাবে কিন্তু কিছুই করে না; অথবা ভাবপ্রবণ, ভাবের উত্তেজনায় সব করে, বুদ্ধির পরামর্শে নয়; অথবা কর্ম্ম-প্রবণ, সর্ব্বদাই কাজ খুঁজিয়া বেড়ায়।

(৪) প্রফুল্ল—কিছুতেই দমে না, হাস্যমুখ ও আনন্দিত চিত্ত। বিমর্ষ—সহজেই দমিয়া যায়, মুখ ভার করিয়া থাকে, অসুখী মনে করে; ভয় পায়; মাঝামাঝি।

(৫) নায়ক—সকল কাজেই এগিয়ে যায়; সঙ্গীদের খেলায় ও চালায়; সাথীদের বিশ্বাস ও ভালবাসা আকর্ষণ করে। অনুবর্ত্তী—অপরের আজ্ঞায়, পরামর্শে বা অধীনে চলিতে বা কাজ করিতে চায়; মাঝামাঝি।

(৬) বিশেষত্ব আছে, সৃষ্টি করিতে চায়, নতুনের উপর লোভ। বিশেষত্বহীন; অপরের কাজ, ভাব অনুকরণ করে।

(৭) উদার চরিত্র; সকলকে ভালবাসে, সকলেরই বন্ধু, সাহায্য করিতে, উপকার করিতে চায়। স্বার্থপর; একা থাকে, কাহারও সহিত ভাব নাই অন্তরের আদান প্রদান নাই; মাঝামাঝি।

(৮) উদারপন্থী; মুক্ত অন্তর; কুসংস্কার দূর করিতে, কুপ্রথা ভাঙ্গিতে চায়, নতুন করিয়া উচ্চ আদর্শে সব গড়িতে চায়। অনুদার; প্রাচীন মত ও বিশ্বাসকে ভালবাসে; লোক মত ও সমাজের সংস্কারকে লঙ্ঘন করিতে চায় না। নবীনকে ভয় করে, মাঝামাঝি।

(৯) আধ্যাত্মিক; সকল ঘটনার এক নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ দেখে। বাস্তব; কল্পনার রঙীন ফানুষ ভালবাসে না, সহজবুদ্ধি প্রখরা; মাঝামাঝি।

(১০) ধর্ম্মের ও নীতির উচ্চ আদর্শের মাপকাটিতে সকল ঘটনার মূল্য

ঠিক করে। আদর্শের শাসন মানে না, কোনটি সুখের তাহাই চায়; শ্রেয়ই তাহার অভিপ্সিত হয়। মাঝামাঝি।

(১১) দায়িত্ব বোধ আছে; চিন্তাশীল, বিবেকানুবর্ত্তী, সদ্‌বিবেচক। দায়িত্ববোধহীন; অন্যমনস্ক, অবিবেচক, মাঝামাঝি।

(১২) প্রতি কাজের মোটা দিকগুলি দেখে। প্রতি কাজের সূক্ষ্ম দিকগুলির উপর নজর।

(১৩) আত্মনির্ভরশীল; আপনার উপর ভরসা আছে; সাহস আছে, আপনার উন্নতির জন্য এগিয়ে যায়। পরাধীন; অপরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে; কখন কাজ করিতে নিজে এগিয়ে যায় না। মাঝামাঝি।

আপন পুত্রের বংশগত জাতিগত দেশগত সমাজগত পরিবার ও অবস্থাগত কি কি দোষ ও গুণ দেহে ও মনে জন্মাইয়াছে, মাতাপিতার তাহা জানা অতি আবশ্যক। তাহা না জানিলে সন্তান-পালনের পন্থা নির্দ্ধারণ করা কঠিন হয়। কারণ দেহের যে অঙ্গ দুর্ব্বল তাহার সম্বন্ধে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে, মনের যে দিকে শক্তির বৃদ্ধির অভাব সেইদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। তাহার যে স্বাভাবিক শক্তি সমাজের বা দেশের কল্যাণকারী আছে, তাহাকে জাগাইতে বাড়াইতে হইবে। যে সদ্‌গুণগুলি তাহার মধ্যে নিহিত সেইগুলিকে বর্দ্ধিত করিবার সুযোগ ও সুবিধা দেওয়াই ত প্রকৃত শিক্ষাদান। দেহের দুর্ব্বলতা দূর করা, অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করা, মনের কু-প্রবৃত্তিকে দমন করাই ত প্রকৃত সন্তান পালন।

যক্ষ্মারোগাক্রান্ত মাতা ও পিতার সন্তান সহজেই যক্ষ্মায় আক্রান্ত হইতে পারে। কারণ সে দুর্ব্বল বক্ষ লইয়া জন্মগ্রহণ করে; ফুসফুসের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাহাকে চিরজীবন সজাগ থাকিতে হইবে। যাহাতে তাহার ফুস্‌ফুসের শক্তি বাড়ে এইরূপ ব্যায়াম করিতে হইবে। তাহার ভাগ্যে জীবনীশক্তি সুস্থ মাতাপিতাদের সন্তান অপেক্ষা কম পড়িয়াছে,—এই

দুর্ভাগ্য মানিয়া লইয়া বংশানুক্রমের বিরুদ্ধে তাহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। তাহার পক্ষে নির্ম্মল বায়ু অপর জন অপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, তাহার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য অপর অপেক্ষা অধিক চাই। নগরের ধূলিমলিন বাতাসে জনতায় বাস করিলে সে অকালে মরিবে,—পল্লীর নির্ম্মল বায়ু ও শান্তির মাঝে সে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে। শিশুকাল হইতে মাতাপিতা যদি তাহাকে সাবধানে যত্ন লইয়া পালন করেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি ফুস্‌ফুসের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে বংশানুক্রমের অভিশাপ হইতে সে বাঁচিবেই।

মাতা বা পিতা যদি স্নায়বিক দুর্ব্বল, বা মাতাল বা সিফিলিস্ গণোরিয়ায় আক্রান্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তান শারীরিক দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হয়; তাহাদের নানা মানসিক ব্যাধি হইতে পারে। বর্ত্তমান কালের মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, সকল চোর ডাকাত,—জুয়া-চোর খুনী ইত্যাদি জগতের সকল বদমাসরা শারীরিক ও মানসিক অসুস্থ। সমাজের সকলেই যদি দেহে ও মনে পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইত তাহা হইলে কোন পাপ বা বিপত্তি ঘটিত না। বদ্‌মাস লোকদের ছেলেদের মধ্যে কুবুদ্ধি ও পাপ করিবার ইচ্ছা লুকাইয়া আছে, সহজেই তাহা জাগিয়া উঠে; শিশুকাল হইতে তাহাদিগকে যদি সঙ্গে সঙ্গে রাখা যায়, সৎবৃত্তিগুলি জাগানো ও বাড়ানো যায় তাহা হইলে তাহারা বংশগত পাপের শিকল ছিঁড়িয়া নূতন জীবন যাপন করিতে পারে।

ইয়োরোপে ও আমেরিকায় অসুস্থ মাতা পিতাদের পুত্রদিগের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গিরিশিখরে, পর্ব্বতের কোলে বা সমুদ্র তীরে মুক্ত স্থানে তাহাদের পাঠাগার। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত মাতাদিগের ছেলেদের ছেলেবেলা নির্ম্মল বায়ুতে রাখা উচিত; তাহাদের পড়ার জন্য খুব বেশী খাটা উচিত নয়; ধীরে ধীরে যাহাতে দেহ সবল হয় তাহার জন্য ব্যায়াম, নিয়মিত আহার, বিহার,

খেলা পাঠ করা উচিত। বাল্যকাল হইতে যদি ছেলেদের সুস্থ ও সবল করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে বংশানুক্রমের অনেক দোষ এড়ান যাইতে পারে। এই সকল বিশেষ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ ছেলেদের পাঠ অপেক্ষা তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বেশী নজর রাখেন; কারণ কেবল বিদ্বান হইলেই ত হইবে না, বিদ্বান অপেক্ষা স্বাস্থ্যবান হওয়া কম দরকার নয়। বিদ্যালাভ করিতে যদি অকালে মরিতে হয় তবে সে বিদ্যায় লাভ কি? সে বিদ্যায় নিজের অপকারই হইল, দেশের, সমাজের বা মানবের কোন কল্যাণও হইল না। আমাদের মত গরীব দেশে অসুস্থ দুর্ব্বল বা বংশজাতব্যাধিগ্রস্ত ছেলেদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় নাই; সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণও ছেলেদের মানসিক উন্নতির জন্যই ব্যস্ত, শারীরিক দোষ বা গুণের প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। দেহ ও মন সুস্থ ও সবল করিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার মাতাপিতাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে।